এপ্রিল ২০০৭ • দশ টাকা

আনন্দমেলা

ব্রজেন দত্তর খুনি কে, শনাক্ত করল পাখি...

পাখি এবার বিক্রমগড়ে

(রহস্য উপন্যাসের শেষ কিস্তি)

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল

(হাসি আর মজাদার কমিক্‌সের শেষাংশ)

ক্যানসারের উৎস খুঁজবে রোবট-ডাক্তার

তিনটি জমজমাট গল্প

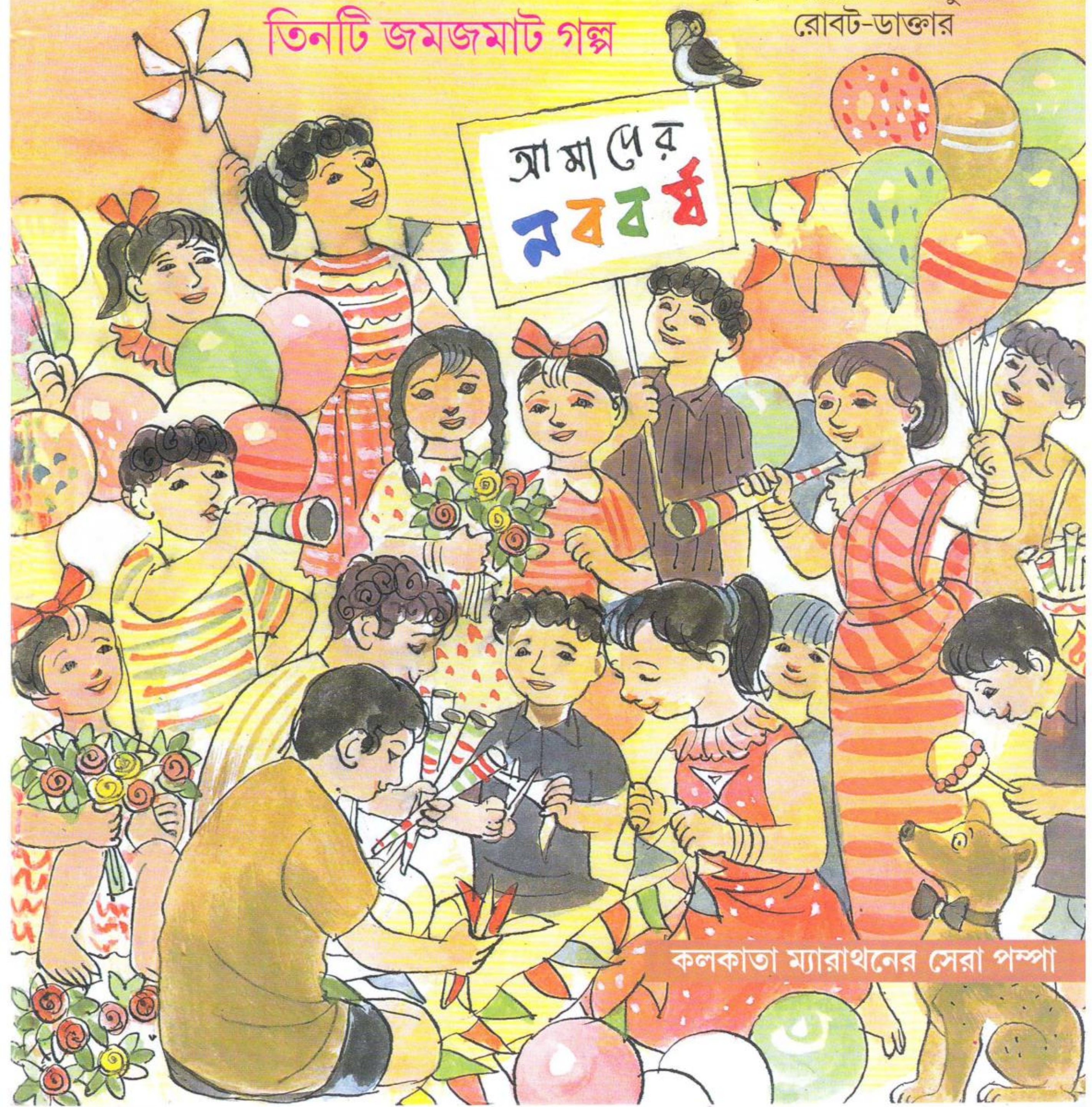

কলকাতা ম্যারাথনের সেরা পম্পা

Hard Copy & Scan - Barun Rej
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

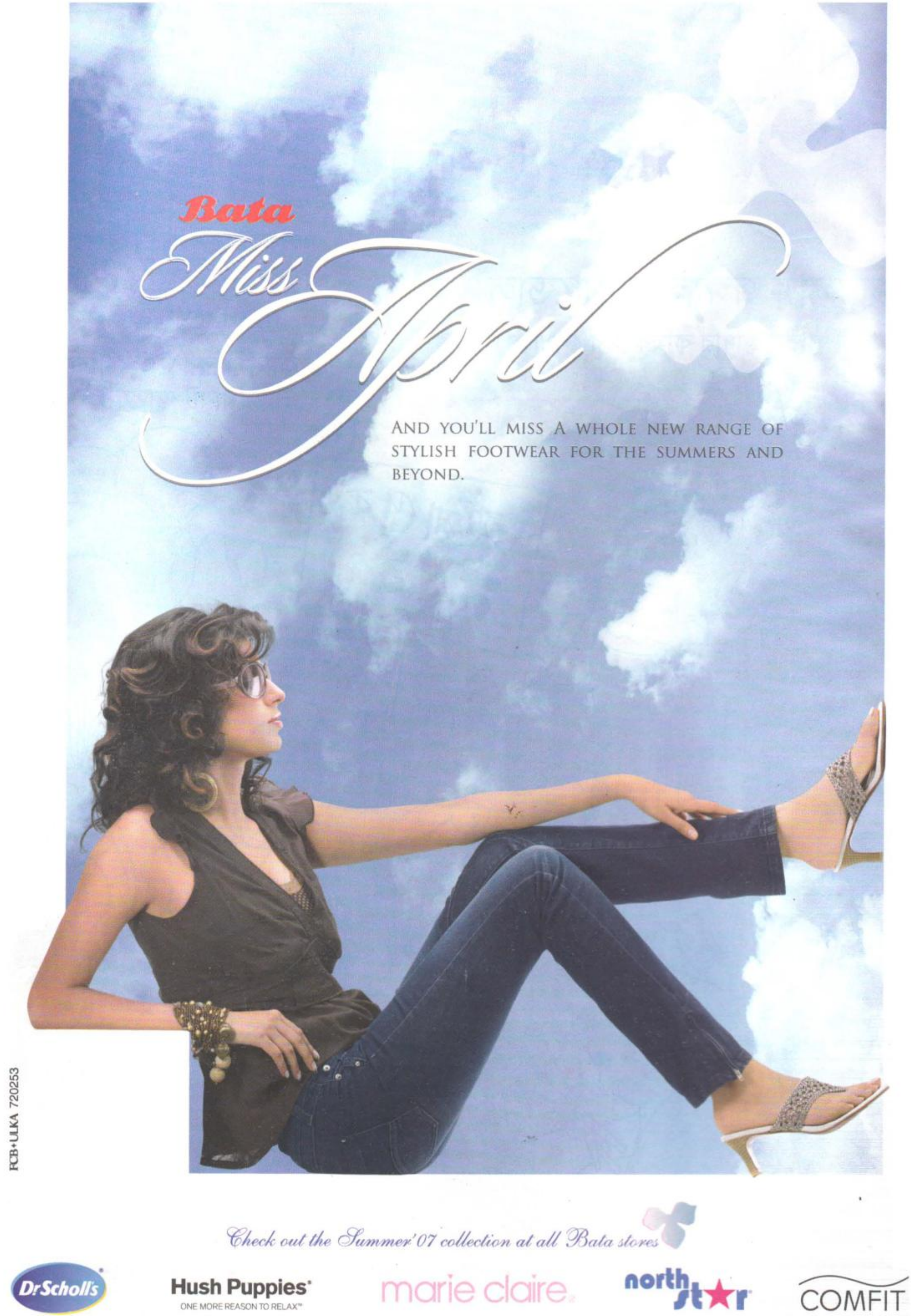
Bata
Miss April
AND YOU'LL MISS A WHOLE NEW RANGE OF STYLISH FOOTWEAR FOR THE SUMMERS AND BEYOND.
Check out the Summer'07 collection at all Bata stores
Dr Scholl's
Hush Puppies
ONE MORE REASON TO RELAX
marie claire
north star
COMFIT
FCB+ULKA 720253

৩২ বর্ষ ১২ সংখ্যা চৈত্র ১৪১৩ এপ্রিল ২০০৭

জমজমাট তিনটি গল্প

৮ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পাশাপাশি শুরু হয়ে গিয়েছে সৌরজগতের বারোটি ক্রিকেটখেলিয়ে গ্রহের মধ্যে 'সোলার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট'।
সন্দীপ দে'র গল্প সৌরকাপ ক্রিকেট ৪৫০৭।

৪৭ কিট্টু রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে তার শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে। রাগ পড়ে গেলে বা মেজাজ ঠান্ডা হলে ফের স্বাভাবিক হয়ে যায় সে।
অরবিন্দ ভট্টাচার্যর দুর্দান্ত গল্প বিজলি বালক।

৫৬ ছেলেবেলার বন্ধু অনিমেষের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে দেখা করবে ভেবেছিল শঙ্কর। এমন সময় এল তার মৃত্যুসংবাদ। কলকাতায় এসে দেখল, মাঝবয়সি একটা লোক মাদারির খেলা দেখাচ্ছে। এই লোকটারই খেলা কি দেখেছিল দুই বন্ধু অনেক দিন আগে?
শিশির বিশ্বাস-এর গল্প ভানুমতীর ভেলকি।

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্‌স

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল ১১

খুন হয়েছে নিতাই পাগলা। গোপালপুরের অখ্যাত কবি ভৈরব কয়েকটি কবিতা লিখেছে ভূত নিয়ে। থানার দারোগাকে সেই কবিতাগুলো শোনাতে গেল। সেখানে হাজির গোয়েন্দা চন্দ্রকান্ত। তাও আবার ছদ্মবেশে। এমন সময় কালীচরণ এল। ওদিকে দুলাল দাসও জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছে। হঠাৎ দূরে কিছু একটা দেখে তার মনে হল, বাঘ নয়তো? ঝট করে লুকনো ছুরিটা বের করল দুলাল। সত্যিই কি বাঘের মুখোমুখি হল দুলাল? মজাদার এই গোয়েন্দা কমিক্‌সের শেষাংশ রহস্যে জমজমাট।
গল্প: সুদীপ্ত নাগ
ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

খেলাধুলো

কলকাতা ম্যারাথন জিতলেন পম্পা ৬৪ চন্দন রুদ্র
সাত সমুদ্র পেরোতে চান রশ্মি ৬৫ উত্তম রায়
ক্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

পাখি এবার বিক্রমগড়ে ৩২

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
নিজের বাড়িতে ব্রজেন দত্ত খুন হয়েছেন। তাঁর আশি হাজার টাকার চেক কেউ ভাঙিয়ে নিয়েছে। খুনির সন্ধানে গিয়ে সমাদ্দারদারোগা ধন্দে পড়েছেন। বিক্রমগড়ে বেড়াতে এসে এই রহস্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল জিনিয়ার বন্ধু পাখি। বাড়ির কাজের মেয়ে তরুদিই কি বিষ খাইয়ে ব্রজেন দত্তকে মেরে ফেলল? নাকি অন্য কেউ! পুলিশের অনুমান, ব্রজেনবাবুর পরিচিত লোকই খুন করেছে তাঁকে। রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা এই উপন্যাসের শেষাংশ!

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৬
উৎসব ৭
অমিল খোঁজো তফাত বোঝো,
হাসছি দ্যাখো ৪২
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৪৩
কুইজ ৪৬
ক্যাম্পাস ৫৫
পাঠকের পাতা ৬১
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৬৩

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

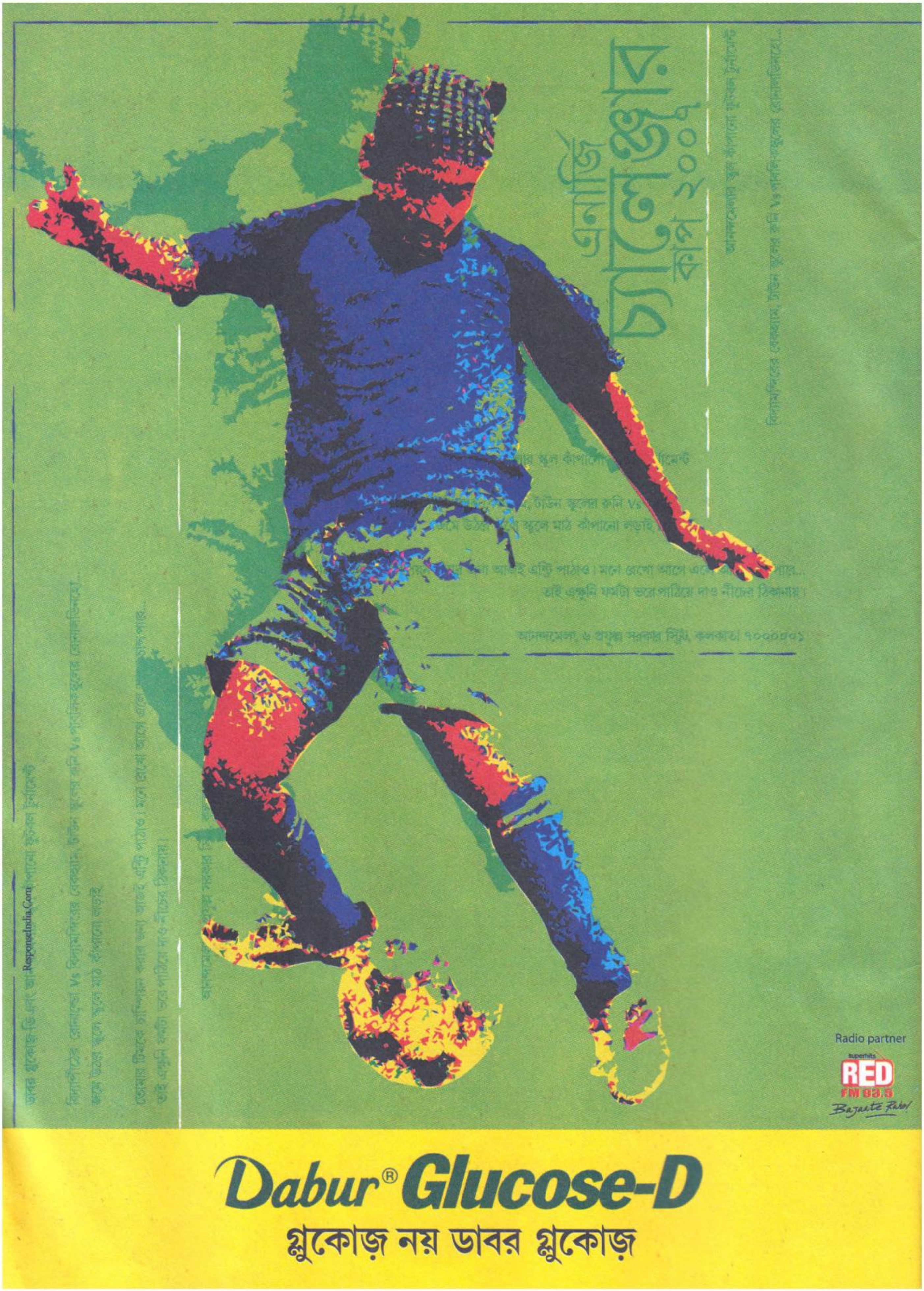

Radio partner
RED
FM 93.5
Bajaate Raho!
Dabur® Glucose-D
গ্লুকোজ় নয় ডাবর গ্লুকোজ়

Dabur® Glucose-D

আনন্দমেলা

এনার্জি চ্যালেঞ্জার কাপ ২০০৭

দম থাকলে জিতে দেখাও

In association with IFA

এসে গেল **ডাবর গ্লুকোজ়-ডি** এবং **আনন্দমেলার** স্কুল কাঁপানো ফুটবল টুর্নামেন্ট **এনার্জি চ্যালেঞ্জার কাপ ২০০৭**

বিদ্যাপীঠের রোনাল্ডো vs বিদ্যামন্দিরের বেকহ্যাম, টাউন স্কুলের রুনি vs পাবলিক স্কুলের রোনাল্ডিনহো...
জমে উঠবে স্কুলে স্কুলে মাঠ কাঁপানোর লড়াই **এনার্জি চ্যালেঞ্জার কাপ ২০০৭** টুর্নামেন্টে।

তোমার স্কুলের টিমকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য আজ থেকেই শুরু করে দাও প্র্যাকটিস।

এক্ষুনি ফোন করো: ২৪৫৪ ৬২১২ নম্বরে।
'প্রথমে এলে প্রথমে পাবে' ভিত্তিতে এন্ট্রি নেওয়া হবে।

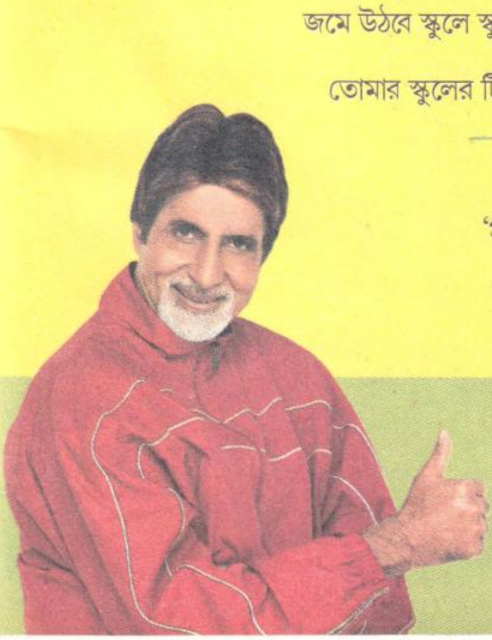

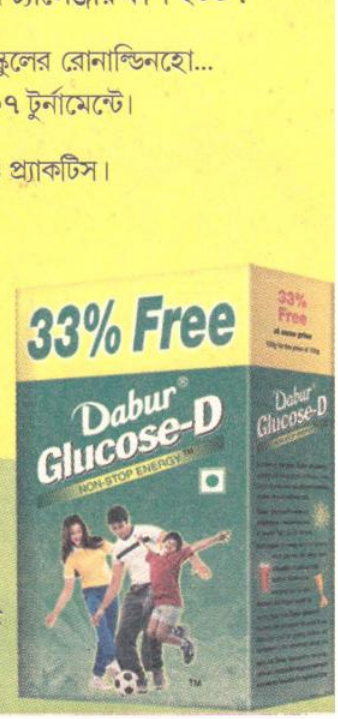

গ্লুকোজ় নয় ডাবর গ্লুকোজ়

ভাল লেগেছে ডিসেম্বর সংখ্যা

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। ডিসেম্বর সংখ্যা পড়ে দারুণ লাগল। গানের জগতে লিট্‌ল চ্যাম্প সঞ্চিতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম এই সংখ্যা পড়ে। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগটি আমার বিশেষ প্রিয়। এই সংখ্যায় 'গোবর্ধন প্লাস হারাধন', 'অসুরগড়ের অদ্ভুত সাপ', গল্প দু'টিও পড়ে ভাল লেগেছে। আমার অনুরোধ, 'অমিল খোঁজো তফাত বোঝো' বিভাগটিতে আরও দু'টি করে ছবি দিলে ভাল হয়। বাংলায় ই-মেল করার পদ্ধতি শিখে আমাদের ভাল লেগেছে।

সোহিনী রায়
সপ্তম শ্রেণি, শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

কমিক্‌স শেষ হোক দু' সংখ্যায়

'আনন্দমেলা' পড়তে ভাল লাগে। আমার মতে, খেলাধুলো সম্পর্কে লেখা আরও তথ্যসমৃদ্ধ হলে ভাল হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কমিক্‌স পড়তেও ভাল লাগে। তবে এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, দু'টি সংখ্যায় কমিক্‌স ছাপা হলে ভাল হয়। পরপর বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে কমিক্‌স ছাপা হলে পড়তে ভাল লাগে না।

গোলাম মুরশিদ
নবম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়

চাই আরও ভূতের গল্প

আমি 'আনন্দমেলা' পড়ি নিয়মিত। 'কানামাছি' উপন্যাসটি পড়ে আমার ভাল লেগেছে। ডিসেম্বর সংখ্যার চারটি গল্পও দারুণ। আমি চাই, আনন্দমেলায় আরও ভূতের গল্প ছাপা হোক।

পুষ্পিতা মল্লিক
ষষ্ঠ শ্রেণি, লেকটাউন গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

খেলোয়াড়ের পোস্টার চাই

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। আমি চাই, আনন্দমেলায় আরও বেশি করে রহস্য উপন্যাস বা রহস্য গল্প ছাপা হোক। 'অমিল খোঁজো তফাত বোঝো'-র উত্তর পরের সংখ্যায় ছাপা হলে ভাল হয়। প্রতি সংখ্যায় একজন খেলোয়াড়ের পোস্টার চাই।

দেবজিৎ ভট্টাচার্য ও সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্য
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

'বিপিনবাবুর বিপদ' দারুণ

প্রতি মাসে 'আনন্দমেলা' পড়ি মন দিয়ে। বিশেষ করে কমিক্‌স পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। ডিসেম্বর সংখ্যায় 'বিপিনবাবুর বিপদ' পড়ে ভাল লেগেছে। আশা করি, আগামী দিনেও আনন্দমেলায় এমনই মজাদার আর জমজমাট সব কমিক্‌স পড়তে পারব।

সায়ন্তন হালদার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, সরিষা
(ই-মেল এর মাধ্যমে)

'স্লিপি হলোর জঙ্গল' গল্পটি সুন্দর

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। মার্চ সংখ্যা আনন্দমেলা পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। আটটি ভূতের গল্পের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আয়নার মানুষ'। 'স্লিপি হলোর জঙ্গল' গল্পটিও বেশ ভয়ংকর এবং সুন্দর। এ ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলোও ভাল। কমিক্‌স এবং ধারাবাহিক উপন্যাসও বেশ ভাল লাগছে। তা ছাড়া অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের নানা অজানা তথ্য এবং সময়সূচি তো আছেই। আনন্দমেলার প্রত্যেকটি সংখ্যা যেন এরকমই জমজমাট হয়।

সায়র গুহ
রামমোহন মিশন স্কুল, যাদবপুর, কলকাতা

'পরভৃৎ' শব্দের অর্থ ঠিকই লেখা হয়েছে

'আনন্দমেলা'র জানুয়ারি সংখ্যা পড়লাম, ভাল লাগল। এই সংখ্যায় আমার চিঠির জবাব পেলাম। নভেম্বর সংখ্যার 'অর্থ শেখো'-র 'পরভৃৎ' প্রসঙ্গে বলতে চাই ভুলটা আমারই। এর জন্য আমি লেখকের কাছে বিশেষভাবে ক্ষমা চাইছি। আমার ভুল সংশোধন এবং বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ। এর পর থেকে অবশ্যই বাংলা বানানের দিকে অবশ্যই নজর দেওয়ার চেষ্টা করব।

অনির্বাণ চৌধুরী
আদ্রা, পুরুলিয়া

'আটাশ' না 'আঠাশ'

জানুয়ারি সংখ্যার গোয়েন্দা কমিক্‌স 'ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল' পড়ে খুব ভাল লাগল। কিন্তু প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পাখি এবার বিক্রমগড়ে' ধারাবাহিক উপন্যাসটির আট নম্বর অনুচ্ছেদে আঠাশ বছরের বানান লেখা 'আটাশ'। আপনারা এর উপর দৃষ্টিপাত করলে আনন্দিত হব!

সুপ্রতিম আঢ্য
চতুর্থ শ্রেণি, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল

সম্পাদকীয় উত্তর: ২৮ সংখ্যাকে কথায় 'আটাশ' বা 'আঠাশ' দুই-ই লেখা যেতে পারে, দু'টিই অভিধানগ্রাহ্য। তবে 'আটাশ' প্রথমে আছে বলে আমরা প্রথমটিকেই বেছে নিয়েছি।

শিশুভারতী সেরা সংকলন
বিশ্বসাহিত্য
বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ১৫০ টাকা
বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, মৃতের পুস্তক (মিশর), নরওয়ে পুরাণ, ইলিয়াড, ওডিসি আর বিশ্ব ক্ল্যাসিক্স-এর এক অনন্য সম্ভার। অতুলনীয় অলংকরণ ও দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফে বইটি সমৃদ্ধ।
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭২৩৩৬
বইপাড়ায় পাবেন : কম্পিউট্রনিক্স, দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড-এ

নতুন বছরের প্রথম দিনটি পালন করার রেওয়াজ এদেশে শুরু হয় মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে। তিনি একটি নতুন ক্যালেন্ডারেরও প্রচলন করেন। লিখেছেন **পায়েল সেনগুপ্ত**

বাংলা নববর্ষ উৎসবের নাম ছিল নওরোজ

কাল মিতান কিছুতেই ঘুম থেকে বেলা দশটার আগে উঠবে না, মা যতই বকুন (অবশ্য মিতান জানে, কালকে অন্তত মা বকবেন না!), কাল কিছুতেই বইখাতা নিয়ে বসবে না, কাল মিতান নতুন জামা পরবে এবং বিকেলে হাজারবার ঠান্ডা লাগার ভয় দেখানো সত্ত্বেও আইসক্রিম খাবে, কোনও বারণ শুনবে না। সারা বছর সকলের বাধ্য হয়ে থাকা মিতান কাল এমন কিছু করবে, যা সারা বছর করতে ওর খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু করে উঠতে পারে না। তবে কাল এমন কী হবে, যাতে মিতানের বচ্ছরকার রুটিন একেবারে বদলে যাবে? কাল যে ১৫ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ! ভুলে গেলে চলবে? একটা আনকোরা নতুন বছর যে দরজায় টোকা মারছে। তুমি ভুলে গেলে তার যে বড্ড মনখারাপ হবে। তবে নতুন বছরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার আগে জেনে নাও কয়েকটা মজার জিনিস!

যেমন ধরো, তুমি কি জানতে বাংলা বছরের প্রথম দিনটা নিয়ে আমরা এত মাতামাতি করলেও এটা কিন্তু আদৌ কোনও বাঙালি চালু করেননি? নতুন বছরের প্রথম দিন পালন করার রেওয়াজটা এদেশে শুরু হয় মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে। ইংরেজি হিসেব অনুযায়ী ১৫৮৫ সালের ১০ বা ১১ মার্চ আকবর 'তারিখ-ই ইলাহি' নামের একটি নতুন ক্যালেন্ডারের প্রচলন করেন।।এই ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটি বেশ জাঁকজমক করে পালন করার প্ল্যানটাও তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। উৎসবের নাম ছিল 'নওরোজ'। আকবর প্রচলিত কিছু উৎসবের পরিবর্তে সারা বছরে যে ১৪ টি নতুন অনুষ্ঠান পালন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, এটি তার মধ্যে অন্যতম। তবে ঠিক কবে থেকে যে উৎসবটির নাম 'পয়লা বৈশাখ' হল, সেটা এখনও খুঁজে বের করতে পারেননি ঐতিহাসিকরা। পারেননি, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ...এই বারোটি মাসের উৎস খুঁজে বের করতে। তবে তাঁদের ধারণা, খুব সম্ভবত নক্ষত্রদের নাম অনুযায়ী এই মাসগুলোর নামকরণ করা হয়। নক্ষত্রদের নামে মাসের নামকরণ করার এই ধারা শুরু হয়, শকাব্দের প্রচলন থেকে। সেই সময় এই উৎসবের প্রধান ব্যাপার ছিল নতুন হালখাতার উদ্বোধন। সাধারণত ব্যবসায়ীরাই নতুন বছরে তাঁদের হিসেবনিকেশ নতুন করে শুরু করতে নতুন হালখাতা খোলার রীতি নিয়ম করে পালন করতেন। তাঁদের কাছে নববর্ষ মানেই ছিল আর-একটা ফিনানশিয়াল ইয়ারের শুরু। এখন নববর্ষ উৎসবটার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে নতুন জামা পরা, বাড়িতে কিংবা বাইরে ভালমন্দ বাঙালিখানা খাওয়া, ভোরবেলা উঠেই প্রভাতফেরি (এই ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় বাংলাদেশে), বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ এবং গানের মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ, ভোরবেলা দক্ষিণেশ্বর কিংবা কালীঘাটে পুজোর জন্য লাইন এবং অবশ্যই গুরুজনদের প্রণাম করে মিষ্টি খাওয়া। তবে বহু যুগ ধরেও কিন্তু ওই হালখাতা খোলার প্রথাটি এখনও বজায় আছে। খোঁজ করে দেখো, ওই দিন কোনও চেনা দোকানে, বিশেষ করে গয়নার দোকানে তোমাদের কারও না-কারও নেমন্তন্ন থাকবেই! যাই হোক, ইতিহাসের ভারী কথা এখন বরং তোলা থাক! আপাতত তোমরাও মিতানের মতো পয়লা বৈশাখের জন্য একটা নতুন রুটিন বানিয়ে ফ্যালো। ঠিক সেই কাজগুলোই করো, যা করতে তোমার সারাবছর ইচ্ছে করবে। কথায় আছে না, বছরের শুরুতে যা করবে, সারা বছর ধরে তা-ই...

সৌরকাপ ক্রিকেট ৪৫০৭

সন্দীপ দে

রিন, রিন, রিন, তিনটি শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল এয়ার ওয়ার্ল্ড যাত্রীবাহী ক্র্যাফ্‌ট-এর যাত্রীদের। অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে বিশ্ব ক্রিকেট দলের পনেরোজন ক্রিকেটার, কোচ, কর্মকর্তা সিটবেল্ট বেঁধে অক্সিজেন সিলিন্ডার, অটোকন্ট্রোল্ড ওয়েট সিস্টেম প্রভৃতি বাঁধতে শুরু করলেন শরীরের সঙ্গে। ক্র্যাফ্‌টের গ্লোসাইন বোর্ডে দেখা যাচ্ছে, দু'শো তিরিশ সেকেন্ড পরেই ছুঁতে চলেছে মঙ্গলগ্রহের বিখ্যাত মার্সালি ক্র্যাফ্‌ট বন্দরের মাটি। অবশেষে গ্লোসাইন বোর্ডে 'জিরো' ওঠা মাত্র ক্র্যাফ্‌টের চাকা স্পর্শ করল মঙ্গলগ্রহ। সমস্ত যাত্রী নেমে যাওয়ার পর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন বিশ্ব একাদশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ম্যাট্‌স, পিছনে বাকি সদস্যরা।

বন্দরের বাইরে ততক্ষণ অপেক্ষমাণ প্রবাসী পৃথিবীর মানুষরা মঙ্গলগ্রহের বিখ্যাত সুগন্ধি হেমরোজ ফুলের মালা নিয়ে পৃথিবীর নানা ভাষায় স্লোগান দিতে শুরু করেছে। ক্রিকেটারদের বরণ করে নেওয়ার পর মার্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সুদৃশ্য এয়ার শাট্‌ল এসে ক্রিকেটারদের নিয়ে চলল মার্সালি শহরের ইলেভেন স্টার হোটেল প্লাজায়। পাশেই এম সি এ স্টেডিয়াম। এখানেই আর মাত্র সাত মঙ্গলদিন পরে হবে সৌরকাপ-৪৫০৭ ক্রিকেটের ফাইনাল।

সৌরজগতের বারোটি ক্রিকেট খেলিয়ে গ্রহের মধ্যে সোলার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে পঞ্চাশ বছর হল। প্রতি পাঁচ পার্থিব বছর অন্তর এই টুর্নামেন্ট হয়। সেই হিসেবে এটি এগারোতম টুর্নামেন্টের ফাইনাল। প্রথম-প্রথম তো মাত্র তিন-চারটি গ্রহের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হত। বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, দ্বাদশ গ্রহ ফোবিলা, এদের অধিবাসীরা মনে করত ক্রিকেট অলসদের খেলা। সেই সময় পৃথিবীর বিখ্যাত ক্রিকেট মার্চেন্ট জন মিয়া অন্য গ্রহগুলোতে ক্রিকেটের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করলেন। প্রথম-প্রথম অনেক বাধা এল। রক্ষণশীল গ্রহগুলো রীতিমতো

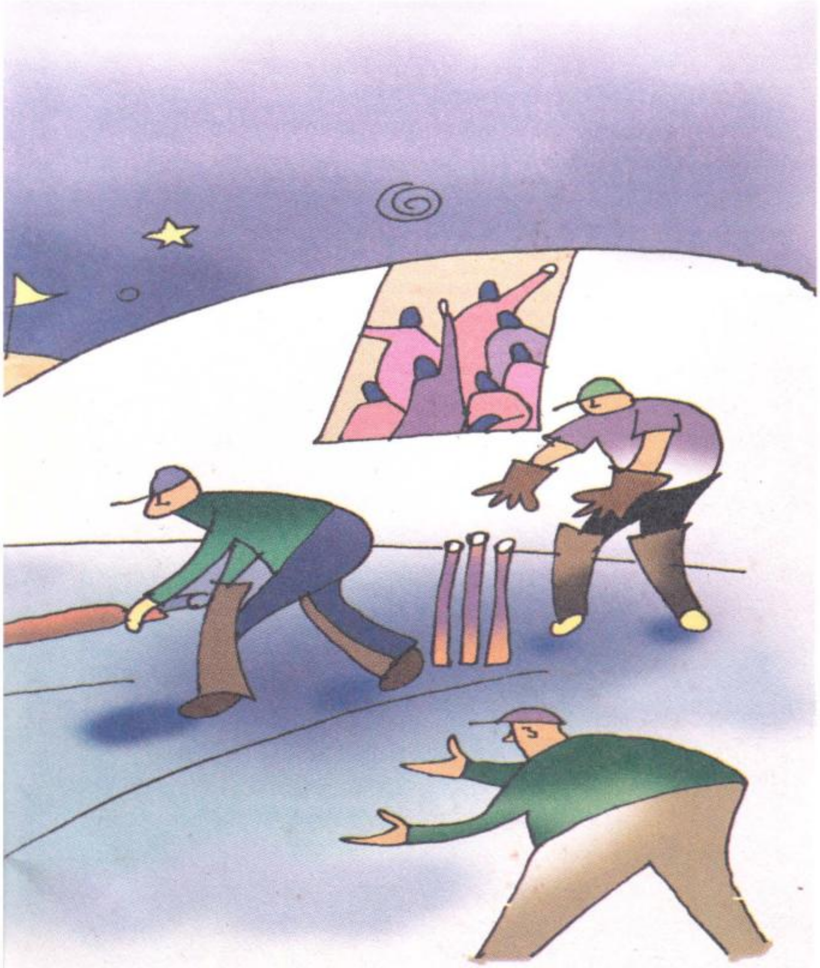

বিক্ষোভ দেখাল। বৃহস্পতি গ্রহে ক্রিকেট খেলা শুরু হলে সেখানকার রক্ষণশীল নেতারা ক্রিকেটারদের একেবারে গ্রহছাড়া করে দিলেন। ফলে ক্রিকেটের বিস্তার থমকে দাঁড়াল। এমন সময় পৃথিবীর মার্চেন্ট জন মিয়া পৃথিবীর বিখ্যাত একঝাঁক ক্রিকেটারকে ওই কয়েকটি গ্রহে পাঠিয়ে সেখানকার নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁদের সাহায্যেই আজ বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ, বড়-বড় ক্রিকেট খেলিয়ে গ্রহগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর দ্বাদশ গ্রহ ফোবিলায় প্রকাশিত স্পোর্টস ম্যাগাজিন জানাচ্ছে যে, ক্রিকেট খেলা ওই গ্রহে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিশেষ করে ওই গ্রহের বড় কোম্পানিগুলোর এগজিকিউটিভ নিয়োগের সময় দেখা হয়, তিনি কত বছর কোন ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। যিনি ক্রিকেট দল পরিচালনা করতে পেরেছেন তিনি বড়-বড় কোম্পানিও সামলাবেন, এটাই এখন ওই গ্রহের অধিবাসীদের ধারণা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য পৃথিবীও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিগুলোতে এখন ক্রিকেটে মাস্টার্স ডিগ্রি পড়ানো হয়। সিলেবাসের মধ্যে থাকে ক্রিকেটের আইনকানুন, হিস্ট্রি অফ ক্রিকেট, ক্রিকেট সম্পর্কে নতুন-নতুন নিয়ম, ধারণা তৈরি করা ইত্যাদি। এর পর ক্রিকেটের উপর পিএইচ ডি-ও করা যায়, ক্রিকেট কোচিংয়ের উপর, ইন্টার প্ল্যানেট্স ক্রিকেট রিলেশনশিপের উপর। তা ছাড়া মেডিক্যাল সায়েন্সেও ক্রিকেট প্লেয়ারদের জিনের উপর প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে। মোদ্দা কথা, ক্রিকেট আর সেই আড়াই হাজার বছরের পুরনো টেস্ট বা ওয়ান ডে-র মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

এ বছর অর্থাৎ পৃথিবীর ৪৫০৭ সালে সৌর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মাস দু'য়েক হল। প্রথমে বারোটি গ্রহের মধ্যে লিগভিত্তিক খেলা হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে। এইভাবে লিগ শেষ হওয়ার পর পয়েন্টে শীর্ষে থাকা দু'টো গ্রহের মধ্যে ফাইনাল। এখনকার ক্রিকেট আড়াই হাজার বছর আগেকার মতো নয়। এখন ছেলেরা হিস্ট্রি অফ ক্রিকেট পড়তে-পড়তে হাসাহাসি করে। তখন তো দু' দিকে স্টাম্পের দূরত্ব ছিল বাইশ গজ মাত্র। আবার তিন-তিনটে উইকেট। আর বলের সর্বোচ্চ গতি নাকি ছিল ঘণ্টায় একশো মাইল। এখনকার দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও হাসবে। দু'জন আম্পায়ার নাকি ওই গরমে মাঠের মধ্যে থেকে খেলা পরিচালনা করতেন। টিভিতে 'ইন্টার প্ল্যানেট্স স্পোর্টস নেটওয়ার্ক' চ্যানেলে তখনকার ক্রিকেট দেখতে-দেখতে ঘুম পেয়ে যায়। ওই জন্যই হয়তো তখন পৃথিবীতে মাত্র দশ-বারোটি দেশ ক্রিকেট খেলত। এখন তো ডেভেলপিং প্ল্যানেটগুলোতেও ক্রিকেটের রমরমা বাজার। তখন নাকি লিগভিত্তিক খেলাগুলোতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ছিল তিন, পরে অবশ্য বোনাস পয়েন্ট আসে। মোট যত বড় ব্যবধানেই জেতো, চার পয়েন্টের বেশি নয়। হারলে তো কিছুই নেই। ক্রিকেটের গ্রহায়নের ফলে অনেক বস্তাপচা সিস্টেম বদলেছে।

এখনকার ক্রিকেট মাঠের আয়তন প্রাচীনকালের মাঠের চেয়ে তিনগুণ বড়। দু' দিকে স্টাম্পের দূরত্ব ছেষট্টি গজ। দু' প্রান্তে একটি করে মোট দু'টো উইকেট পোঁতা থাকে। বলের আকার খানিকটা কমেছে। এখন বলে ক্রসভাবে চারটি সেলাই থাকে। এতে ফাস্ট বোলাররা বেশি সুবিধে পান। এক-একবারে আউটসুইং, ইনসুইং দুইই হতে পারে। আগে নাকি এক-একবারে একটিই আউটসুইং বা একটিই ইনসুইং হত। স্পিন বোলাররাও এখন এক-একবারে দু'রকম স্পিন করাতে পারেন। এ ছাড়াও এখন আরও অনেক রকম বোলিং আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, 'হপ-স্টেপ' বল, এই ধরনের বোলিংয়ে বলটি দু'বার পিচে পড়ার পর প্রচণ্ড জোরে ব্যাট্সম্যানের দিকে ধেয়ে যাবে। এই ধরনের বলকে মোকাবিলা করার জন্য ব্যাট্সম্যানকে সাধারণত বলটি প্রথমবার পিচে পড়ার পর দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার পিচে পড়ার পরই সজোরে মারতে হবে। এ ছাড়া আরও এক রকম বল হয়, 'কামব্যাক অ্যান্ড গো ফরোয়ার্ড' বল। এই ধরনের বল সকলে করতে পারেন না। বলটি পিচে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে

খানিকটা বোলারের দিকেই ফিরে আসে, তারপর আবার ব্যাট্‌সম্যানের দিকে এগিয়ে যায়। খুব মারাত্মক বল। ব্যাট্‌সম্যান বলের হদিশ পান না, ক্যাচ তুলে ফিরে আসেন। তবে এই বোলিংয়ে বোলিং অ্যাকশন খুব সন্দেহজনক, ইন্টার প্ল্যানেট্‌স ক্রিকেট কাউন্সিল-এর কর্মকর্তারা প্রায়ই বোলারদের কনুই, কবজি, ঘাড় মাপামাপি করেন। এখন মাঠের মধ্যে দু'টো বাউন্ডারি লাইন থাকে।

প্রথম বাউন্ডারি লাইন — এটি পেরোলে চার রান, উপর দিকে গেলে ছয়।

পরেরটি ওভার বাউন্ডারি লাইন, এটি পেরোলে আট, উপর দিকে গেলে দশ রান। এখনকার ক্রিকেটে টেকনোলজির অনেক সাহায্য নেওয়া হয়। বোলাররা তাঁদের কব্‌জিতে একটি চিপ্‌স বাঁধেন। এতে বোলিংশক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায়। ফাস্ট বোলারদের বোলিং স্পিড ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল পর্যন্ত হয়। ছেষট্টি গজের পিচ এমনভাবে তৈরি করা, যাতে সেখানে বল পড়ার পর তার গতি সামান্যতমও কমে না। এ ছাড়া ব্যাট্‌সম্যান ও উইকেটকিপাররা এত দ্রুত আসা বল ঠিকমতো দেখার জন্য চোখে বিশেষ মাইক্রোলেন্স পরেন। মাঠের মধ্যে কোনও আম্পায়ার থাকেন না। মাঠের বাইরে দু'জন আম্পায়ার সব সময় কম্পিউটারের সামনে বসে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশ মাঠের বিশাল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। টিমের কোচ তাঁর দলের প্লেয়ারদের খেলা চলাকালীন মাঠে মাইক্রো মোবাইলের সাহায্যে দরকারি টিপ্‌স দেন। ফলে খেলা খুব জমে ওঠে।

মঙ্গলগ্রহে পৌঁছনোর পরদিন সকালে স্টেডিয়ামে গেল গোটা পৃথিবীর ক্রিকেট দল। এখন দলের সঙ্গে একজন পদার্থবিদও থাকেন। প্রথমেই কোচের নির্দেশে স্টেডিয়ামের চারপাশে এক অদৃশ্য নেট লাগিয়ে দেওয়া হল। ফলে টিমের প্র্যাক্টিস বাইরে থেকে দেখা গেল না। এর পর পদার্থবিদ মঙ্গলগ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ মেপে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ওজন কতটা কমাতে-বাড়াতে হবে, তা নির্ণয় করে দিলেন। এর পর টিমের ডাক্তার, খেলোয়াড়দের সেই রকম ওজনে নিয়ে আসেন। এ ছাড়া অক্সিজেনের দরকার কতটা, তা ঠিক করে প্রত্যেকের শরীরের সঙ্গে লাগানো অক্সিজেন স্কিন সিলিন্ডার চালু করে দেওয়া হল। এইভাবে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে সিজনড করাতেই পুরো দিন চলে গেল। এদিকে তো স্টেডিয়ামের বাইরে সাংবাদিকদের উপচে পড়া ভিড়। তারই মধ্যে পৃথিবী থেকে আসা সাংবাদিকরা, কোচ ও ক্যাপ্টেনের বাইট নিয়ে গেলেন।

অবশেষে এল কাঙ্ক্ষিত ফাইনালের দিন। ফাইনালে বিশ্ব একাদশ বনাম মার্স ইলেভেন। মঙ্গলের দলটির হোম অ্যাডভান্টেজ প্রচুর। কম্পিউটারে বোতাম টিপে টস হয়ে গেল। টসে জিতল বিশ্ব একাদশ। ওয়ান-ডে খেলা, পঁচিশ ওভার করে মোট চারটি ইনিংস, দু'টো দলের দু'টো করে। বিশ্ব একাদশের ব্যাটিং প্রথমে। এখনও ছ' বলে ওভার হয়। তবে দু'জন বোলার পরপর বল করেন তিনটি করে, অল্টারনেটলি। প্রথমে পঁচিশ ওভারে যথাসম্ভব কম উইকেট খোয়াতে হবে, না হলে পরের ইনিংসে চাপে পড়ে যেতে হবে। প্রথম পঁচিশ ওভারে বিশ্ব একাদশের রান উঠল চার উইকেটে তিনশো আশি। দু'জন ওপেনারই সেঞ্চুরি করলেন। এর পর মঙ্গলের দল প্রথম পঁচিশ ওভারে করল পাঁচ উইকেটে তিনশো পঁয়ষট্টি। মাত্র পনেরো রানের তফাত। এর পরেই আসল খেলা। এখন কৃত্রিম আলোয় খেলা হয় না। খেলার দিন মঙ্গলগ্রহের আবর্তনকাল কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সন্ধে আর হতে চায় না। তাই শিশির, কুয়াশা ইত্যাদির ঝামেলা এড়ানো যায়। স্টেডিয়ামে উপচে পড়া ভিড়। স্টেডিয়ামের বাইরে প্রচুর মঙ্গলিয়ান হুঙ্কার ছাড়ছে। মার্সের প্রেসিডেন্ট নিজে স্টেডিয়ামে হাজির। এরই মধ্যে বিশ্ব একাদশ তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল চার উইকেটে তিনশো আশি রান থেকে। পরের পঁচিশ ওভারে মঙ্গলের বোলারদের যথেচ্ছ পিটিয়ে বিশ্ব একাদশের রান উঠল দু' ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেটে সাতশো ছেচল্লিশ। অর্থাৎ মঙ্গলকে জিততে হলে দ্বিতীয় ইনিংসে বাকি পাঁচ উইকেটে করতে হবে তিনশো বিরাশি রান। এমন কিছু অসম্ভব নয়। এই সময় বিশ্ব একাদশের ক্যাপ্টেন সুপার সাব ব্যবহার করে নামালেন তুরুপের তাস কাম ব্যাক অ্যান্ড গো ফরোয়ার্ড ভারতীয় বোলারকে। কয়েক ওভারের মধ্যেই মঙ্গলের রান দাঁড়াল আট উইকেটে পাঁচশো বিয়াল্লিশ। এখনও অনেক দূর, পারবে কী মঙ্গল প্রথমবার সৌরকাপ জিততে? নাকি পৃথিবীই পরপর তিনবার সৌরকাপ জিতবে? টানটান উত্তেজনা, মঙ্গলের দশ নম্বর ব্যাট্‌সম্যান পরপর দু'টো দশ মেরেছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ রান ভাল উঠছে না। পৃথিবীর দিকের গ্যালারি থেকে সাদা ফ্ল্যাগ নাড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলের গ্যালারিতে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা। হঠাৎ মঙ্গলের আলো কমে এল। আম্পায়াররা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখালেন, খেলার সাময়িক বিরতি। মঙ্গলের টিভিতে বিজ্ঞাপন 'নতুন গ্রহ আবিষ্কার করুন'। কিন্তু আলো কেন কমে আসছে? পৃথিবীর দলের পদার্থবিদ তড়িঘড়ি যন্ত্রপাতি বের করে দেখলেন, মঙ্গলের আবর্তনকাল হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। ফলে তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মঙ্গলের বিজ্ঞানীদের কারসাজি। খেলা বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত। আই পি সি সি-ও এর মধ্যে আছে। কিছুতেই পৃথিবীকে সৌরকাপ জিততে দেবে না। ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মাথায় হাত। ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্তারা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করলেন নিজেদের গ্রহের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। কাজ শুরু হল সঙ্গে-সঙ্গে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা প্রথমেই সময়কে স্টপ করে দিলেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তারপর দ্রুত মহাজগৎকে টাইম মেশিনের সাহায্যে কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দিলেন। ধীরে-ধীরে মঙ্গলগ্রহে আবার সূর্যের আলো। মঙ্গলবাসীরা প্রমাদ গনলেন। নিরপেক্ষ আম্পায়াররা খেলা শুরুর নির্দেশ দিলেন। বাকি দু'টো উইকেট ফেলতে বেশি সময় লাগল না বিশ্ব একাদশের বোলারদের। জিতে গেল বিশ্ব একাদশ। সৌরকাপ পৃথিবীর ক্যাপ্টেনের হাতে। পরের দিন পৃথিবীর সংবাদপত্রে হেডলাইন বেরোল 'বিজ্ঞানীরা জেতালেন সৌরকাপ'। সঙ্গে ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীদেরও বিশাল ফোটো।

ছবি: দেবাশিস দেব

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্স ● শেষাংশ এ সংখ্যায়

গল্প: সুদীপ্ত নাগ

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

এ তো দেখছি একেবারে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। নট নড়নচড়ন।
হ্যাট হ্যাট কর। তা হলেই যাবে।
এটা কি ঘোড়া নাকি, যে হ্যাট হ্যাট করব?
ঘোড়া? এটা গাধারও অধম।
এই আপনার দোষ! এই বললেন বেড়াল, এই বলছেন গাধা। আপনার কথার ঠিক নেই কেন বলুন তো?

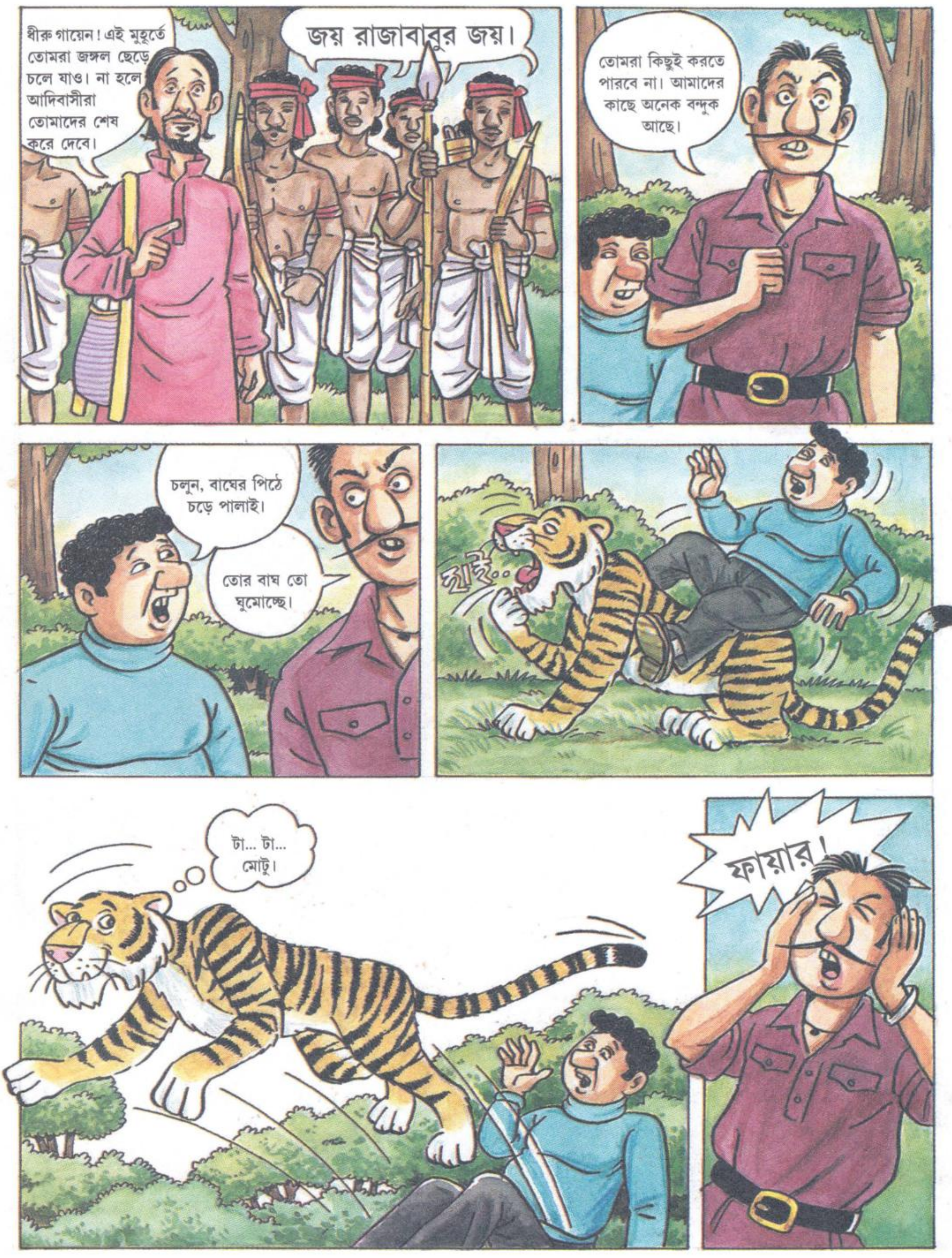
ধীরু গায়েন! এই মুহূর্তে তোমরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও। না হলে আদিবাসীরা তোমাদের শেষ করে দেবে।
জয় রাজাবাবুর জয়।
তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদের কাছে অনেক বন্দুক আছে।
চলুন, বাঘের পিঠে চড়ে পালাই।
তোর বাঘ তো ঘুমোচ্ছে।
টা... টা... মোটু।
ফায়ার!

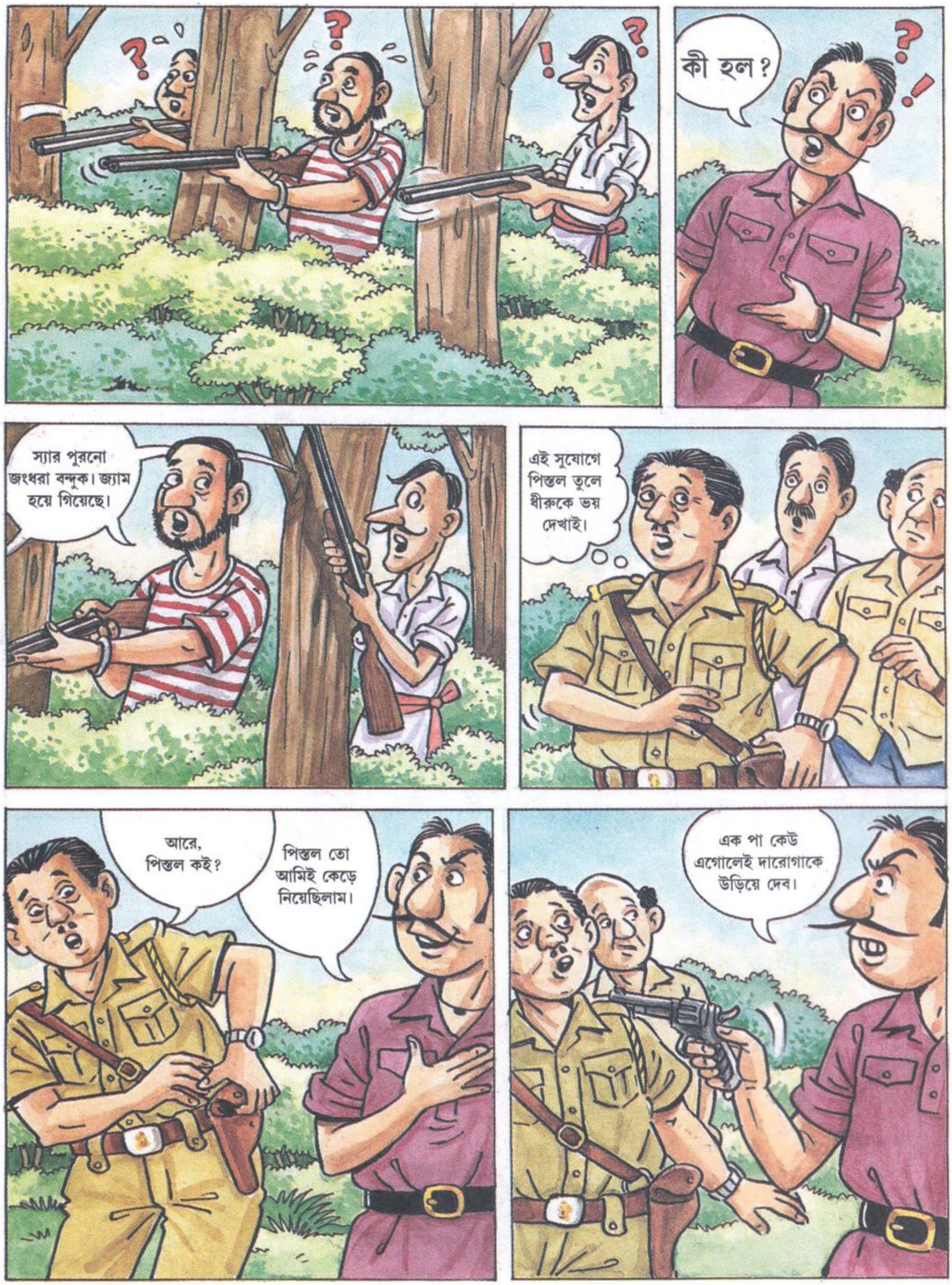
কী হল?
স্যার পুরনো জংধরা বন্দুক। জ্যাম হয়ে গিয়েছে।
এই সুযোগে পিস্তল তুলে ধীরুকে ভয় দেখাই।
আরে, পিস্তল কই?
পিস্তল তো আমিই কেড়ে নিয়েছিলাম।
এক পা কেউ এগোলেই দারোগাকে উড়িয়ে দেব।

আমার পিস্তল নিয়ে হুমকি দিচ্ছেন! হা-হা-হা! আমি তো পিস্তলে গুলিই ভরি না।
?!?
গুলি নেই? তা হলে এগোও ভাইসব। আমি কবিতা বলে উৎসাহিত করছি।
কবিতা! আমি সারেন্ডার করছি।
যাক বাবা! বাঁচা গেল। এবার নিশ্চিন্ত।
নমস্কার কত্তা।
আরিব্বাস! এই জঙ্গলেও তুই ধাওয়া করেছিস।
'কবিতার ঘায়ে ধীরু গায়েন কুপোকাত' — কালকের এই হেডলাইনটা কেমন হবে বলুন তো?
জ্ঞান ফেরার পর...
আরে বাঘ!

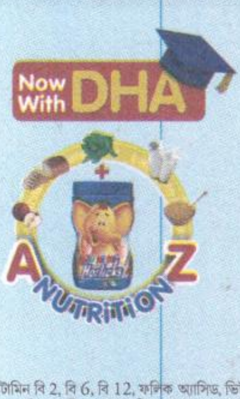

JUNIOR Horlicks 123 ™

*ভিটামিন বি 2, বি 6, বি 12, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, আয়রন এবং ক্যালশিয়াম-^2 টি পরিবেশনে, US NRC 2001 অনুসারে। • জুনিয়ার হরলিকস্ হল একটি পুষ্টিকর পরিপূরক যা দৈনন্দিন সুষম আহারের অঙ্গ হিসাবে আপনার শিশুর পুষ্টি-র প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করতে পারে। • এই উৎপাদনটি কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু-র দুধের বিকল্প অথবা 2 বছরের নীচের বাচ্চাদের শিশু আহার নয়।

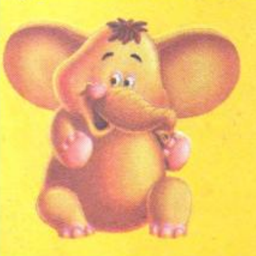

পুরো নাম...বয়স..........................

ঠিকানা (পিনকোডসহ)...

....ফোন..

(ঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দিন। আপনার শিশুর দৈনন্দিন আহারের সঙ্গে জুনিয়র হরলিকস দিলে...

- [ ] আপনার শিশুর পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে
- [ ] A থেকে Z নিউট্রিশন দিতে সাহায্য করে*
- [ ] উপরের সবগুলোই

ResponseIndia.Com

শিশুদের দুষ্টু মুহূর্তগুলোই নিঃসন্দেহে ওদের সেরা মুহূর্ত।

জুনিয়র হরলিকস এবং **সানন্দা**-র আয়োজনে
সেই সেরা মুহূর্তের উদযাপনে **দুদ্দাড় দুষ্টুমি...**
আপনার শিশুর (২ থেকে ৫ বছর) **সঙ্গে আপনার উপভোগ্য মুহূর্তের একটি ৫ ইঞ্চি** x **৭ ইঞ্চি রঙিন ছবি পাঠিয়ে দিন**
দুদ্দাড় দুষ্টুমি, সানন্দা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০০১-এ।
বিচারকদের রায়ে শ্রেষ্ঠ দশটি ছবি প্রকাশিত হবে
১৫মে সানন্দা-তে। আপনার এবং শিশুর পরিচয়
(নাম,বয়স, ঠিকানা) ছবির পিছনে লিখতে
ভুলবেন না। সঙ্গে অবশ্যই ফর্মটি ভরে পাঠাবেন।

আর থাকছে ১২মে এবং ১৩মে এক মজার ইন্টারঅ্যাক্টিভ
কার্নিভ্যাল প্রিয় সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সিটি সেন্টার কলকাতা-এ।
জুনিয়র হরলিকস এবং সানন্দা দুদ্দাড় দুষ্টুমির কার্নিভ্যালে
যোগ দিতে ফোন করুন ২৪৪৯ ৯০৯৪ নম্বরে।

বাঘটার বোধ হয় আমাকে ভাল লেগেছে। ব্যাটাকে পুষলে বেশ ভাল হয়।
আজ আমার জীবন সার্থক হল।
ব্যাটা ধুমসো টংকরের চেয়ে এ অনেক হালকা।
হাল্‌লুম!
বাঘ পুষলে ভয়েই লোক আমাকে ফাংশনে নিতে রাজি হবে। তখন আমি নামী শিল্পী হয়ে উঠব।
অন্য দিকে...
আচ্ছা ধীরু, হঠাৎ তুমি দারোগাদের ধরলে কেন?
ভেবেছিলাম, দারোগাকে ধরে তার মুক্তিপণ হিসেবে প্রোফেসরের ফরমুলাটা নেব। আর জগমোহনকে বাঘে খাইয়ে মজা দেখব।

ফরমুলা দিয়ে কী হবে? তুমি কি জানো না প্রোফেসর শঙ্কু শেষ অবধি কিছুই আবিষ্কার করতে পারেন না!
অ্যাঁ! এর জন্য কালীচরণই দায়ী। ও-ই প্রোফেসরের খবরটা ছাপিয়েছিল।
ধীরুবাবুর মন ভাল করার জন্য আমার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা শোনাচ্ছি।
হ্যাঁ, তুমি ধীরুকে কবিতা শোনাও। আমি বরং একটু ঘুরে আসি।
আপনারা এত ঢিলে কেন বলুন তো? এতক্ষণে কী সুন্দর জেলে চলে যেতাম। অন্তত কবিতা শুনতে হত না।
সুস্বাগতম! আসুন এবার কবিতার আসর জমানো যাক।
আপনারা আমার বাঘ দেখে ভয় পাচ্ছেন না যে বড়!
এ তো সেই টংকরের বাঘ। ব্যাটা ঘাস খেলেও আমি অবাক হব না।
ওকে তো ঘাস খাইয়েই এনেছি।

ব্যাটা টংকরকে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এই জঙ্গলে কত বাঘ! আর কোথা থেকে সার্কাসের একটা বুড়ো বাঘ আনল।
POLICE
WBP 199
যাক, থানা থেকে গাড়িও চলে এসেছে। নিশ্চয়ই কালীচরণ খবর দিয়েছে।
খুব তো বাঘ দিয়ে খাওয়াবেন ভেবেছিলেন! এবার হল তো?
আঃ! বাঁচা গেল। এবার একটু নিশ্চিন্তে নস্যি নেওয়া যাক।
ওরে বাবা!

ওর ওই একটাই নেশা স্যার। সার্কাসের ম্যানেজার নস্যি নিত কিনা!
আমি ওর পেট কেটে নস্যির ডিবে বের না করলে আমার নাম লোচন দারোগাই নয়।
খবরদার, আমার বাঘের গায়ে হাত দেবে না। টুকরো-টুকরো করে ফেলব।
?
ওরা ঝগড়া করছে। এই সুযোগে পালাই।
ধরো ধরো, ব্যাটা পালাচ্ছে। কাতুকুতু দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না!
ব্যাটা বাঘ তখন নড়ছিলই না, এখন ঘোড়দৌড় শুরু করেছে।
ঘেউ!!

আপনি আর কী করলেন চাঁদুবাবু? আমার বাঘের এক ঢেকুরেই তো ধীরু গায়েন কুপোকাত। নিন, এবার জিপে তুলুন।
আমি ধীরু গায়েনের পরাজয় নিয়ে এর মধ্যেই একটা কবিতা লিখে ফেলেছি। শুনবেন?
আমিও তো মনে-মনে আমার হালুম বাঘকে নিয়ে একটা গান বেঁধেছি।
আহা — সে এক ছোট্ট হালুম। তার মালিক দুলাল দাস।
ওঃ! এরকম গান গাইলে আমি আর চালাব না।
দুলাল দাস, এখন একটু চুপ করুন। পরে তবলা বাজিয়ে গানটা শোনাবেন।
POLICE
এবার তা হলে আমি আমার কবিতা শুরু করি!

দোহাই ভৈরব!
ঠিক আছে। আমিও আর কোনও দিন কবিতা শোনাব না। তখন ওরা বুঝবে কী হারিয়েছে।
থানায় ফিরে...
এবার বিপিনবাবুর আম চুরির কেসটা দেখা যাক। ফাইলটা বের করি।
কী করে তোর থেকে রেহাই পাই বল তো?
কেমন গাড়ি পাঠিয়ে দিলাম বলুন?
চায়ের দোকানে...
ভৈরব, তুমিই আমাদের দলবল নিয়ে গিয়ে বাঁচালে। তোমাকে তো কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত।
আমাকে যদি স্যার একটা 'কবিরত্ন' উপাধি দিতেন!

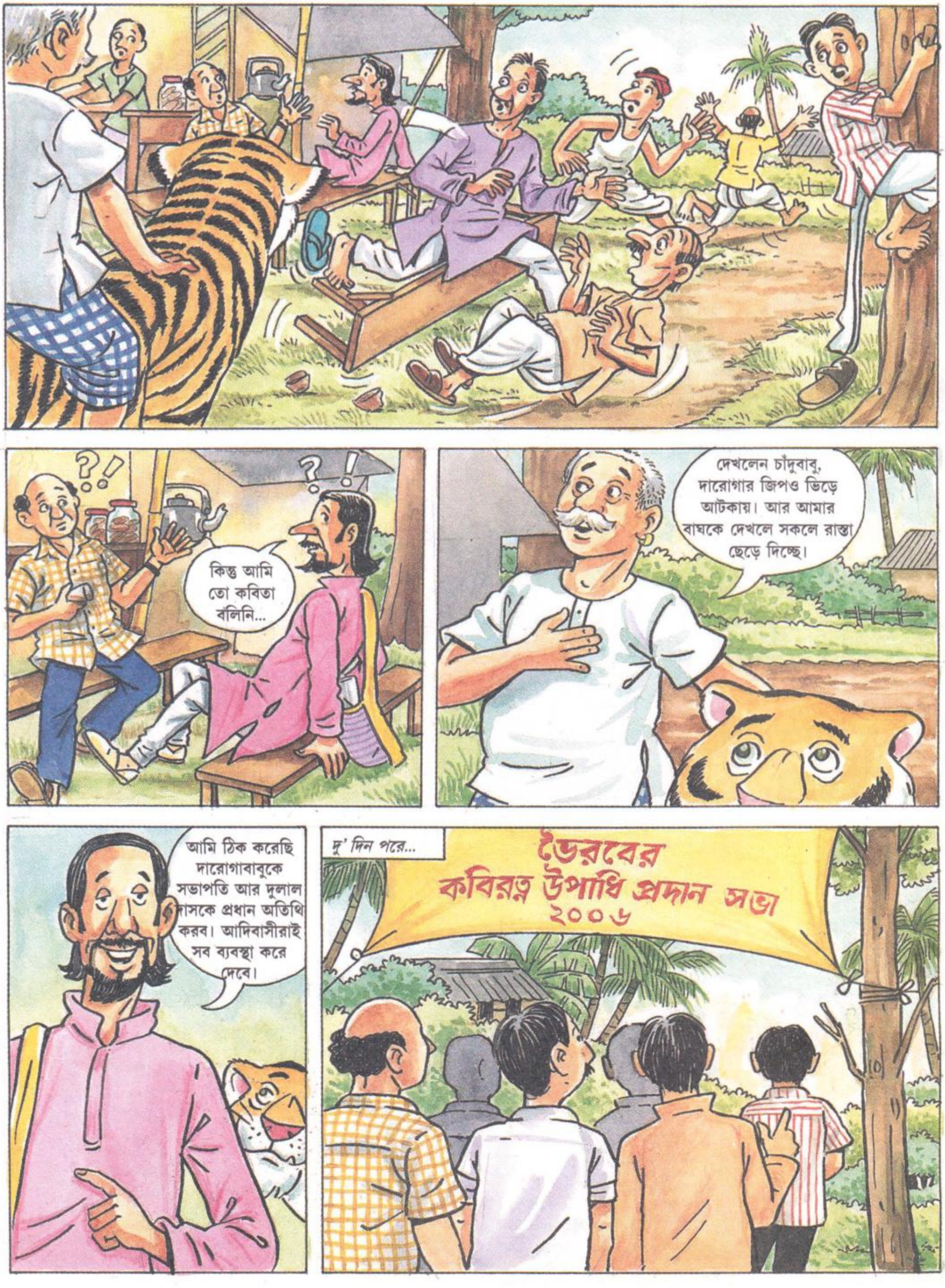
কিন্তু আমি তো কবিতা বলিনি...
দেখলেন চাঁদুবাবু, দারোগার জিপও ভিড়ে আটকায়। আর আমার বাঘকে দেখলে সকলে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে।
আমি ঠিক করেছি দারোগাবাবুকে সভাপতি আর দুলাল দাসকে প্রধান অতিথি করব। আদিবাসীরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।
দু' দিন পরে...
ভৈরবের কবিরত্ন উপাধি প্রদান সভা ২০০৬

দুলাল দাসকে দেখছি না?
এই তো আমি। যেখানে আমি সেখানেই বাঘ।
বাপ রে!
আপনারা শান্ত হোন।
POLICE
এই বাঘটা কিচ্ছু করবে না। দেখুন, আমি এর মাথায় হাত রাখছি।
একটু নস্যি হবে নাকি দাদা?
এই রে! মনে হচ্ছে ব্যাটা নস্যির গন্ধ পেয়েছে!
ফোঁস্ ফোঁস্

তাড়াতাড়ি কৌটোটাকে লুকোতে হবে।
একবার থানায় ফিরি। তারপর তোকে ফাটকে পুরব। পকেটমার কোথাকার!
শাবাশ। দেখুন, কেমন ডাকাতি করে নস্যির ডিবে ছিনিয়ে নিল। যতই হোক, আমারই তো!
ডাকাতি কোথায়? ছিচকে পকেটমারি।
গোটা গোপালপুর গ্রামের লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে নস্যি নিল। তা আবার দারোগারই পকেট থেকে? ডাকাতি নয় বললে হবে?

সুস্বাগতম।
ওরে বাবা! স্টেজে টিকটিকি আছে, আমি কিছুতেই উঠব না।
ভৈরব, তুমি একলাইন কবিতা শোনাও না, তা হলেই টিকটিকিটা ভয়ে পালাবে।
কী যে বলেন! আমি যখন বাড়িতে কবিতা পড়ি, দেওয়ালে একটা টিকটিকি চুপ করে শোনে।
দুলাল দাস, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। যে ভৈরবের কবিতা চুপ করে শোনে, সে বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।
ইটাকে ফাপড়ায়েন দিছি।*
* এটাকে ছুড়ে ফেলছি।

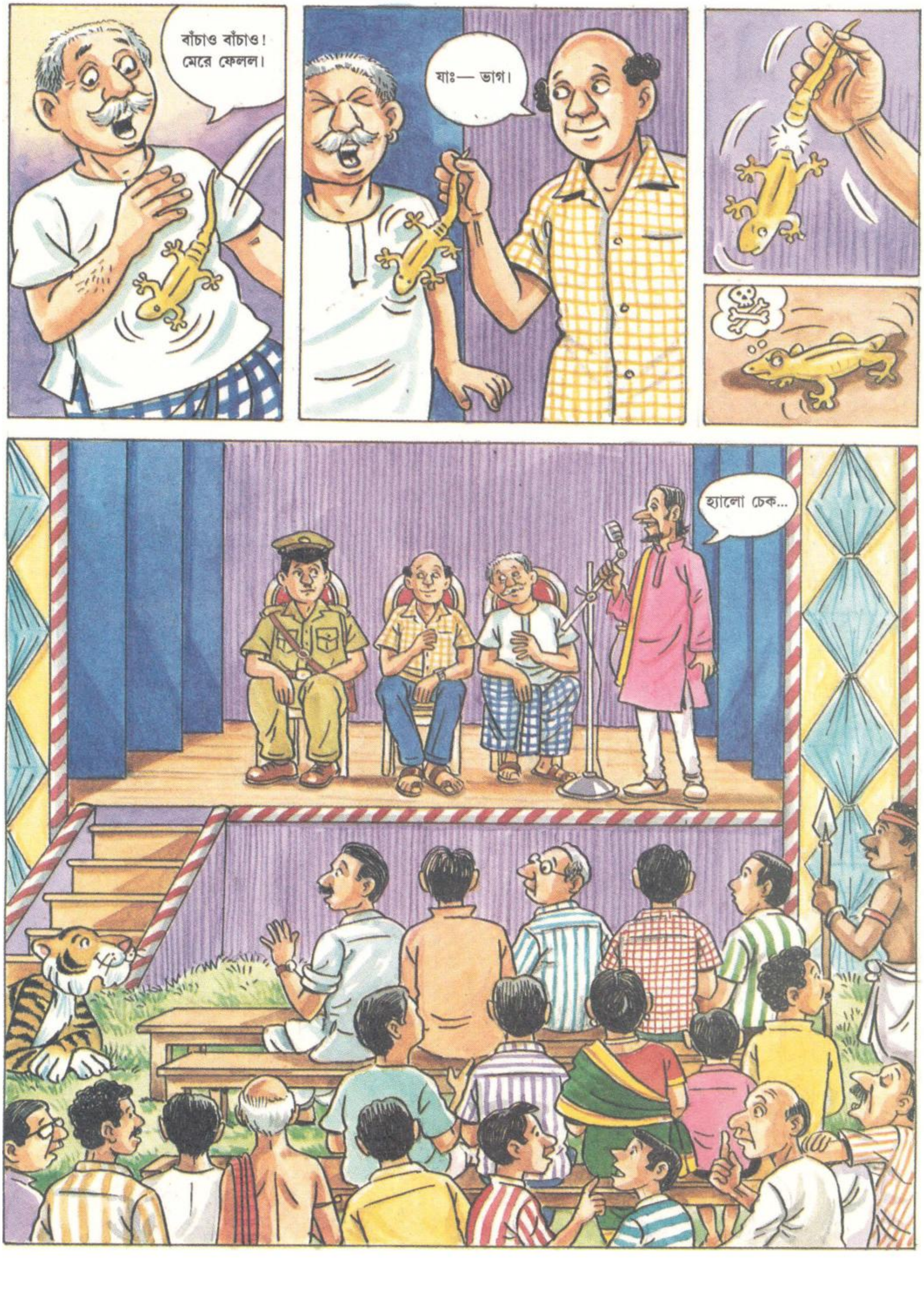
বাঁচাও বাঁচাও!
মেরে ফেলল।
যাঃ— ভাগ।
হ্যালো চেক...

দারোগাবাবু, কিছু ভাবছেন?
আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষ! আপনার কি এত ঘাবড়ালে চলে?
দারোগাবাবু আমাদের সভাপতি। তিনিই প্রথম ভাষণ দেবেন।
ভৈরব 'কবিরত্ন' উপাধি পাওয়ায় আমি খুব আনন্দিত। তবে কিনা আমার শরীরটা ভাল নেই। আমি দুলাল দাসকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

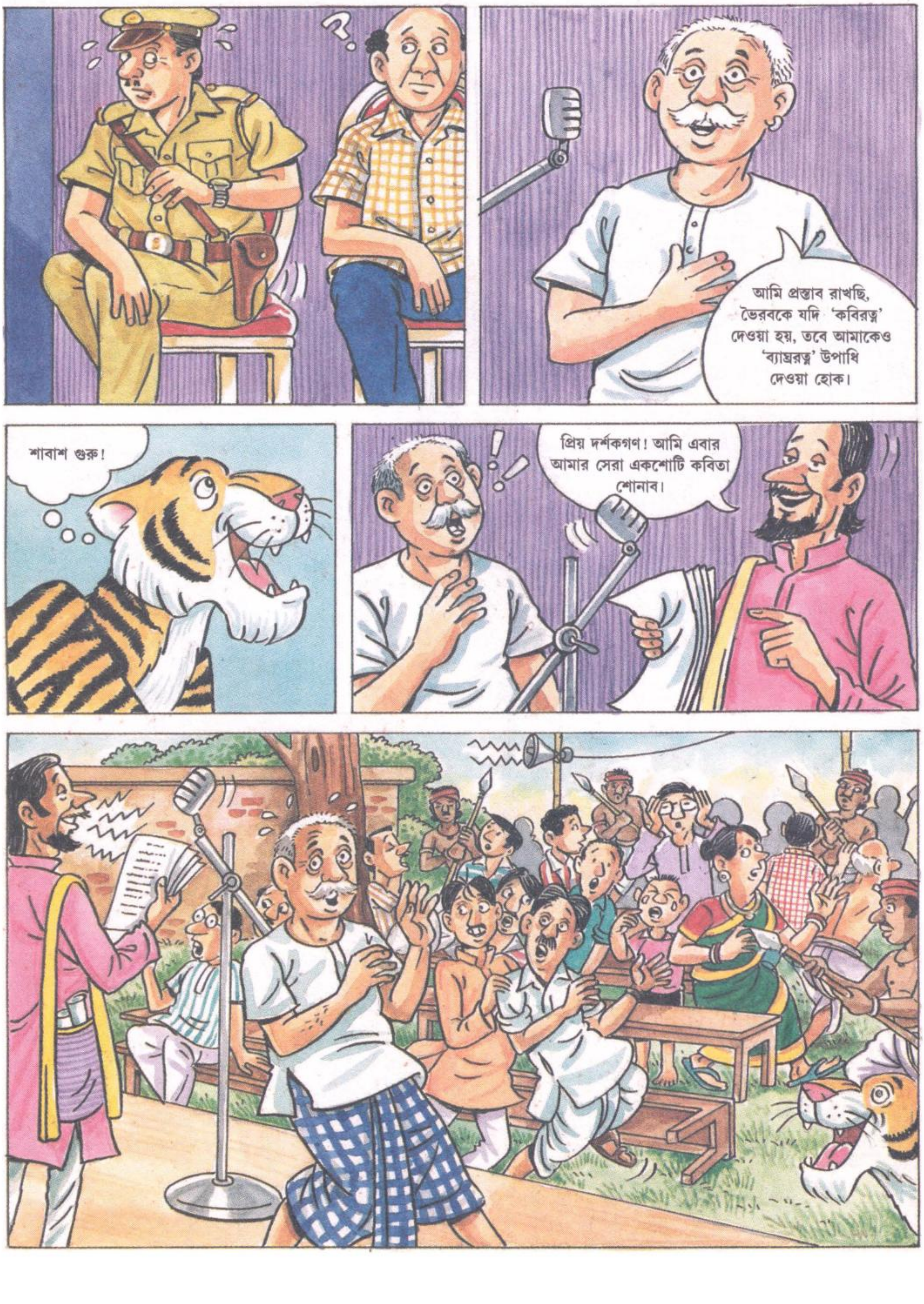
আমি প্রস্তাব রাখছি, ভৈরবকে যদি 'কবিরত্ন' দেওয়া হয়, তবে আমাকেও 'ব্যাঘ্ররত্ন' উপাধি দেওয়া হোক।
শাবাশ গুরু!
প্রিয় দর্শকগণ! আমি এবার আমার সেরা একশোটি কবিতা শোনাব।

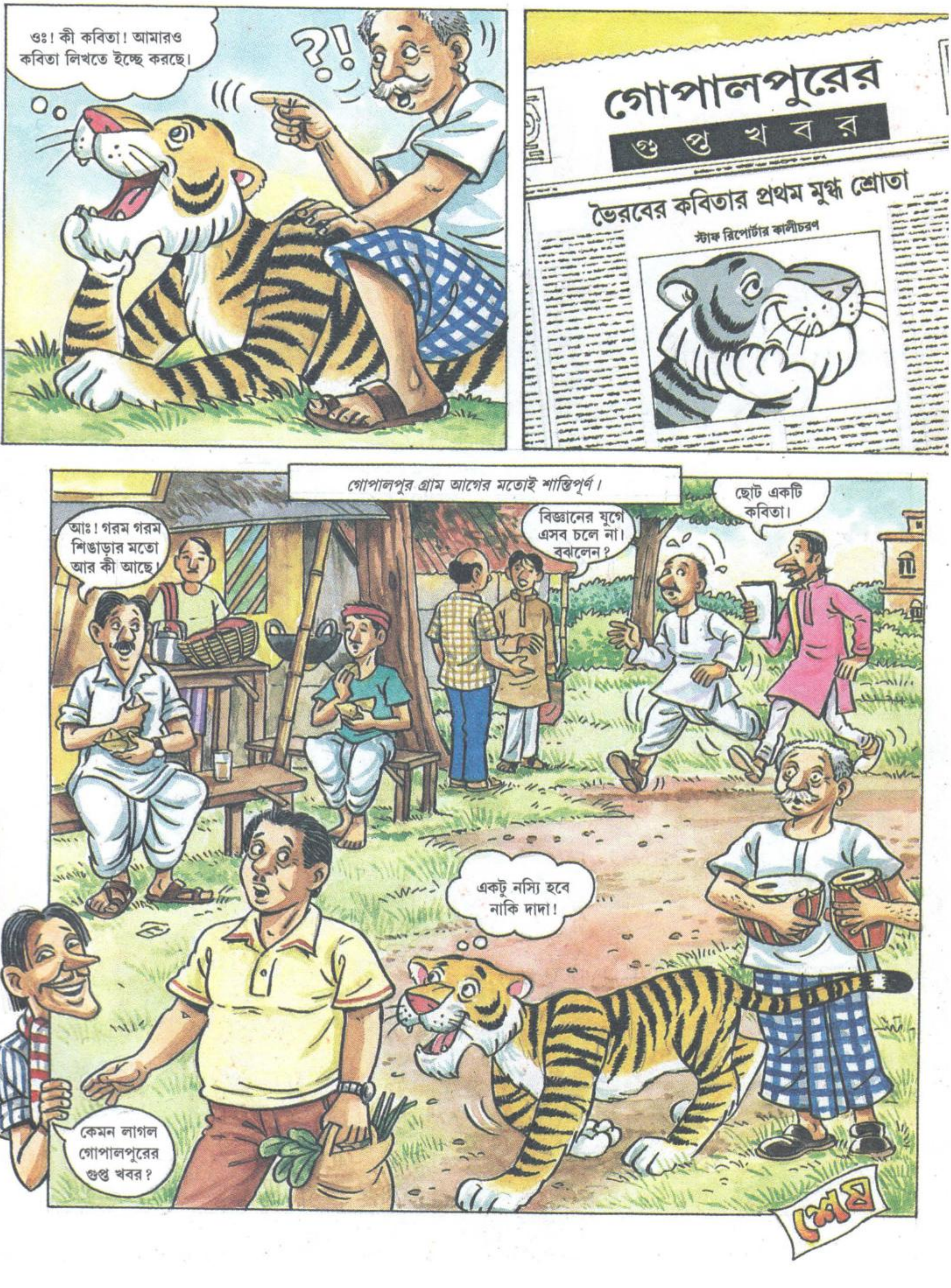
ওঃ! কী কবিতা! আমারও কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে।
?!
গোপালপুরের
গু প্ত খ ব র
ভৈরবের কবিতার প্রথম মুগ্ধ শ্রোতা
স্টাফ রিপোর্টার কালীচরণ
গোপালপুর গ্রাম আগের মতোই শান্তিপূর্ণ।
আঃ! গরম গরম শিঙাড়ার মতো আর কী আছে!
বিজ্ঞানের যুগে এসব চলে না। বুঝলেন?
ছোট একটি কবিতা।
একটু নস্যি হবে নাকি দাদা!
কেমন লাগল গোপালপুরের গুপ্ত খবর?
শেষ

পাখি এবার বিক্রমগড়ে

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

***আগে যা ঘটেছে:** ব্রজেন দত্ত খুন হয়েছেন। কেউ ভাঙিয়ে নিয়েছে তাঁর আশি হাজার টাকার চেক । সমাদ্দারদারোগা খুনির সন্ধানে গিয়ে ধন্দে পড়েছেন। জিনিয়ার বন্ধু পাখি বিক্রমগড়ে বেড়াতে এসে এই রহস্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল। বাড়ির কাজের মেয়ে তরুদিই কি বিষ খাইয়ে ব্রজেন দত্তকে মেরে ফেলল? নাকি অন্য কেউ! পুলিশের অনুমান, ব্রজেনবাবুর পরিচিত লোকই খুন করেছে তাঁকে। রহস্যে আর রোমাঞ্চে উপন্যাসের শেষাংশ এবার জমজমাট!*

॥ ১৮ ॥

"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ পাখি," চিন্তিত মুখে বললেন কাকিমা, "এই সব বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে তোমাদের লেখাপড়ার খুবই ক্ষতি হচ্ছে। সাত থেকে কুড়ি দিন হয়ে গেল, আর কত দিন তোমরা এভাবে এখানে বসে থাকবে? তা ছাড়া তোমার বাবা-মা কী ভাবছেন? তার চেয়ে তোমরা বরং এক কাজ করো, এক তলার ড্রয়িংরুমে তোমাদের মেজোকাকা আর রণবীরদাদু কীসব জরুরি কাজ নিয়ে বসেছেন। তোমরা গিয়ে তোমাদের সমস্যাটা খুলে বলো। ওঁরা নিশ্চয়ই দারোগাবাবুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে তোমাদের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিডর ধরে এগোতে-এগোতে সমাদ্দারদারোগার গলা শুনতে পেল দু' বন্ধু। পাখি চোখের ইশারায় জিনিয়াকে দাঁড়াতে বলল। দরজার আড়ালে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল দু' বন্ধু।

"বলেন কী, বিষ? বিষ দেওয়া হয়েছে বাবাকে?" মিহিরবাবুর গলা চিরে ছিটকে বেরোয় শব্দগুলো।

"বিষ নয়, ঘুমের ওষুধ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, প্রথমে কড়া ডোজে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয় ভিক্টিমকে, তারপর ছুরি চালিয়ে খুনটা করা হয়। মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ আগে কফি খেয়েছিলেন ব্রজেনবাবু। সম্ভবত তাতেই মেশানো হয়েছিল ঘুমের ওষুধটা," কথা থামিয়ে হঠাৎই প্রশ্ন করলেন সমাদ্দারদারোগা, "আপনার বাবা তো ঘুমের ওষুধ খেতেন, তাই না মিহিরবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে খেতেন শরীর খারাপ থাকলে বা টেনশন বেশি হলে। ইন ফ্যাক্ট, ডাক্তারবাবুই বলেছিলেন খেতে।"

"বেশ, বেশ। তা ওষুধপত্র কে দিতেন আপনার বাবাকে?"

"আমার স্ত্রী আর তরু। এরা দু' জনই বাবার ওষুধপত্তরের দিকটা সামলাত।"

"তা ওষুধপত্তর সব থাকত কোথায়?"

"বাবার শোওয়ার ঘরেই, টেবিলের একটা ড্রয়ারেই সব ওষুধপত্তর থাকত।"

"ড্রয়ার কি তালাবন্ধ থাকত?"

"না, সেরকম তো কিছু..."

"বাঃ, বাঃ, চমৎকার। ঘুমের ওষুধ আন-লক্‌ড অবস্থায়, কে বলবে এটা শিক্ষিত বাড়ি!"

"কী করে জানব দারোগাবাবু যে, এমন নির্মম মানুষও আছে, যে একজন অসহায় আশি বছরের বৃদ্ধকে খুন করার জন্য প্রথমে ঘুমের ওষুধ, তারপর ছুরি... উঃ, ভাবা যায়!" সমাদ্দারদারোগার ব্যঙ্গের উত্তরে বললেন মিহির দত্ত।

"কিন্তু আমি একটা অন্য কথা ভাবছি অফিসার," কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে রণবীর সান্যাল বললেন, "কফি তো কেবল ব্রজই খায়নি, আমিও খেয়েছিলাম। তরুই এনেছিল কফি, আর খাওয়ার পর সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল কাপ দু'টো। তবে কি তরুই...?"

গম্ভীর গলায় সমাদ্দারদারোগা বললেন, "অসম্ভব নয়। এমন হতেই পারে যে, ঘুমের ওষুধ তরুই মিশিয়েছিল কফিতে। তারপর সেই কফির কাপ তুলে দিয়েছিল ব্রজেনবাবুর হাতে। পরে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে ভাল মানুষের মতো সেই কাপ দু'টো ধুয়েও রেখেছিল।"

"কী সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত তরুর এই কাজ! বিষ মেশানো ওই কাপ যদি আমার হাতে আসত... উঃ, কী ভয়ংকর! আমি আর ভাবতে পারছি না," ভীত গলায় বললেন রণবীর সান্যাল।

"সত্যি, আপনি হাসালেন দারোগাবাবু। শেষ পর্যন্ত তরুর মতো শান্ত নির্বিরোধী মেয়েটাকে কিনা আপনি কালপ্রিট ঠাওরালেন? ধন্য আপনার কল্পনাশক্তি!" হো হো করে হেসে উঠলেন মিহির দত্ত।

"একটা কথা কিন্তু ভুলে যাবেন না মিহিরবাবু," শান্ত গলায় সমাদ্দারদারোগা বললেন, "আপনাদের এই নিরীহ, শান্ত মেয়েটিই কিন্তু প্রতি মাসে মাইনে ছাড়াও তিন হাজার টাকা আপনার বাবার কাছ থেকে আদায় করত। কে বলতে পারে যে, তরু কোনও কারণে আপনার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করছিল কি না? এমন হতেও তো পারে, তিন হাজারের বদলে পাঁচ হাজার টাকার জন্য আপনার বাবাকে চাপ দিচ্ছিল তরু। এবং সঙ্গত কারণেই আপনার বাবা রাজি না হওয়ায় আক্রোশে তরু এই কাজ করেছে।"

"এত সব জেনেও তা হলে তরুকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন অফিসার?" যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে মন্তব্য করলেন রণবীর সান্যাল।

"শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে যে কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না, এটা তো একটা দুধের শিশুও জানে রণবীরবাবু," চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন সমাদ্দারদারোগা, "প্রথমত, কফির কাপে কোনও হাতের ছাপ ছিল না। দ্বিতীয়ত, ঘুমপাড়ানি কফি খেয়ে ব্রজেনবাবু মারা যাননি, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মাত্র। সেই সুযোগে ছুরি মেরে তাঁকে খুন করা হয়। ছুরিটিতেও কোনও হাতের ছাপ ছিল না। অতএব প্রমাণ হয় না যে, তরুই এ কাজ করেছে," থেমে-

থেমে বললেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

"তবে কি নিবারণ?"

"হয় তরু না হয় নিবারণ এ কাজ করেছে, সেকথাও এখন আর নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ইন ফ্যাক্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পুরো কেসটার চরিত্রটাই বদলে দিয়েছে। শুধু তরু বা নিবারণই নয়, মিহিরবাবু, সুধীরবাবু, আশাদেবী, সুকল্যাণ, কেউই আর সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। প্রত্যেকেরই কিছু না-কিছু মোটিভ আছে একথা ভুলে যাবেন না!"

"আপনি কিন্তু এবার ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন দারোগাবাবু," চাপা রাগে গরগর করতে-করতে বললেন মিহির দত্ত, "আমাদের প্রত্যেকেরই সোসাইটিতে একটা পজিশন, সম্মান আছে সেটা ভুলে যাবেন না যেন!"

"খুনখারাপির মোটিভ সকলের মতো আপনারও হয়তো ছিল মিহিরবাবু," শান্ত গলায় বললেন সমাদ্দারদারোগা, "বাবার অজান্তে বেনামে 'রোজ় এক্সপোর্টস', নামে একটা কোম্পানি খুলে সানফ্লাওয়ারের ক্যাপিটালের বেশ কিছুটা অংশ চুপিসারে সরিয়ে ফেলেছিলেন। এটা কি অস্বীকার করতে পারেন মিহিরবাবু? আপনার ভয় ছিল যে, যদি আপনার বাবা এ ব্যাপারটা জানতে পারেন! তাই তাঁকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়াটা আপনার পক্ষে কম জরুরি ছিল না।"

"আপনি কী করে জানলেন এসব? আমি তো কাউকে বলিনি," ভয় পাওয়া গলায় কোনও মতে বললেন মিহির দত্ত।

"জানতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও আমাদের অনেক কিছুই জানতে হয় মিহিরবাবু," নিরাসক্ত গলায় বললেন সমাদ্দারদারোগা, "যেমন, ইচ্ছে না থাকলেও জানতে হয়েছে ব্রজেনবাবুর মৃত্যুর দিন বিকেলবেলায় ফল কাটার নাম করে আশাদেবী রান্নাঘর থেকে যে ছুরিটি নিয়ে এসেছিলেন, পরে সেটিই ব্রজেনবাবুকে হত্যা করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।"

"মিহিরের মতো মোটিভ তো অন্যদেরও থাকতে পারে?" বাধা দিয়ে বললেন রণবীর সান্যাল।

"পারেই তো। যেমন বাবার ব্যবসাপাতি, বিশেষত সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টস থেকে বাদ পড়ায় সুধীরবাবুর মনেও প্রচণ্ড আক্রোশ জমে ছিল। আর সেটারই সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি বাবাকে খুন করে। আবার একইভাবে এটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, একটা স্ট্রং মোটিভ সুকল্যাণেরও ছিল।"

"তখন থেকে কী যে আজগুবি বকছেন," প্রতিবাদ না করে পারলেন না রণবীর সান্যাল, "ওই দুধের ছেলেটা করবে খুন? বেচারি নিজের জ্বালাতেই জ্বলে-জ্বলে একশেষ।"

"দুধের ছেলেটির এই অবস্থার জন্য ব্রজেনবাবুই কি দায়ী ছিলেন না?" জবাব দিলেন সমাদ্দারদারোগা, "তার এই দুর্গতির জন্য পুরোপুরি দায়ী ব্রজেনবাবুকে খুন করে বুকের জ্বালা শান্ত করার একটা ইচ্ছে সুকল্যাণের থাকতেই পারে।"

"একটা ছোট ছেলের নামে যা খুশি অপবাদ দিলেই আমরা সব মেনে নেব ভেবেছেন? দেশে কি আইন-আদালত উঠে গিয়েছে ভেবেছেন?" প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন মিহির দত্ত।

কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঘুমের ওষুধ কফিতে মেশানোর সুযোগ সুকল্যাণেরও ছিল, যেহেতু ওই ধরনের ওষুধের একটা স্টক তার নিজের কাছেই থাকত। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হল, সুকল্যাণ ছিল একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট।"

"কেন, মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হওয়াটা কি অপরাধ?" ব্যঙ্গোক্তি করে উঠলেন মিহির দত্ত।

"না, অপরাধ নয়। তবে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হওয়ার সুবাদে হিউমান অ্যানাটমি অর্থাৎ মানবদেহের গঠন ও তার কাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান একমাত্র সুকল্যাণেরই ছিল। মানব শরীরের ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করলে প্রায় তৎক্ষণাৎ মানুষ মারা যায়, এ জ্ঞান একমাত্র সুকল্যাণেরই ছিল। আর ছিল বলেই প্রথমে সে কফি খাইয়ে দাদুকে আচ্ছন্ন করে দিল, যাতে কোনও ধরনের প্রতিরোধ তিনি করতে না পারেন। তারপরে পিছন থেকে আসল জায়গায়..."

"কফি তো দিল তরু। এর মধ্যে আবার সুকল্যাণ আসছে কোথা থেকে?" তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন রণবীর সান্যাল।

"হয়তো সুকল্যাণের নির্দেশ মতোই তরু কফির কাপে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ছিল। মনে রাখবেন, কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। কষ্টিপাথরে সোনা যাচাইয়ের মতো করে প্রত্যেকের মোটিভ, অ্যাকশন যাচাই করে তবেই ফাইনাল ডিসিশানে আসতে হবে। এ বাড়ির লোকগুলোর মধ্যেই খুনি লুকিয়ে আছে, এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।"

শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের কথা শেষ হওয়ার আগেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল জিনিয়া। দু' হাতে মুখ ঢেকে করিডরের মেঝের উপরেই বসে পড়ল সে। বাঁধভাঙা কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠতে থাকল তার শরীর। প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল পাখি। তারপরেই ঝুপ করে জিনিয়ার পাশে বসে পড়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই জিনিয়া, কী হল? কাঁদছিস কেন! কী হল কী, বলবি তো?"

কাঁদতে-কাঁদতেই জিনিয়া বলল, "আমি আর শুনতে পারছি না রে। এখান থেকে আমায় নিয়ে চল তুই।"

জিনিয়ার জন্য বুকটা মুচড়ে উঠল পাখির। সত্যিই তো বোন হয়ে নিজের দাদার সম্বন্ধে এই সব ভয়ংকর কথা কতক্ষণ সহ্য করা যায়?

জিনিয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে পাখি বলল, "সেই ভাল, এখানে দাঁড়িয়ে এই সব ছাইপাঁশ না শুনে আমরা আমাদের ঘরে যাই চল।"

॥ ১৯ ॥

নিজেদের ঘরে ফিরে এসেও শান্ত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না জিনিয়ার মধ্যে। বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "ভাবতে পারিস আমার দাদা, কাকারা, তরুদি, নিবারণকাকা এঁদের মধ্যেই কেউ একজন খুনি! এঁদেরই কোনও একজনের হাতে আমার অসহায় বৃদ্ধ দাদু খুন হয়েছেন। উঃ ভগবান, এর চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন? এর পর তো এঁরা আমাকেও একদিন..."

জিনিয়ার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে পাখি বলল,

"আজেবাজে কথা না বলে তুই আগে শান্ত হয়ে আমার কথা শোন।"

"রাখ, রাখ এসব কথা, অন্যকে লেকচার দেওয়া খুব সোজা, বুঝলি! তোর নিজের যদি আমার মতো অবস্থা হত, দেখতাম, তোর এত লম্বা-চওড়া লেকচার কোথায় থাকত?" ঝাঁঝিয়ে উঠল জিনিয়া।

"দ্যাখ জিনিয়া, তুই আমার নিজের বোনের মতো। তোর কষ্ট আমারও কষ্ট। তোর কষ্ট কমাবার জন্যই বলছি, তুই একটু শান্ত হয়ে আমার কথাগুলো শোন," অবুঝ, রাগী শিশুকে শান্ত করার ধৈর্য নিয়ে বলল পাখি।

শেষ পর্যন্ত জিনিয়া সামলাল নিজেকে। চোখের জল মুছে শান্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসল। দু' হাত কোলের উপর রেখে ফোলা-ফোলা চোখ-মুখ নিয়ে পাখিকে বলল, "কী বলবি, বল?"

জিনিয়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পাখি বলল, "একটা কথা কিন্তু তোকে প্রথমেই মানতে হবে জিনিয়া যে, তোর দাদুর মৃত্যুটা কিন্তু কোনও বাইরের মানুষের হাতে হয়নি। হাজারও বাজে কথার মাঝে এ কথাটা কিন্তু দারোগাবাবু ঠিকই বলেছেন।"

"দারোগাবাবুর হয়ে ওকালতি করতে কে বলেছে তোকে?" রীতিমতো ফুঁসে উঠল জিনিয়া।

"ওকালতি নয় রে জিনিয়া। একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ, তা হলে তুইও মানবি কফিতে বিষ, আই মিন ঘুমের ওষুধ মেশানোর কাজটা কিন্তু কোনও বাইরের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তোর দাদুকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, জানে এবং যাকে দেখলে দাদুর মনে কোনও সন্দেহ হবে না, এমন কোনও ঘনিষ্ঠ মানুষই এটা করেছে।"

"তার মানে তরুদি। তুই এটাই বলতে চাইছিস তো? ওই দারোগাবাবুর মতো তুইও বলতে চাইছিস যে, তরুদি আর দাদা মিলে পুরো কাজটা করেছে। তরুদি ঘুমের ওষুধ মেশানো কফিটা খাইয়ে কাপটাপ নিয়ে চলে যাওয়ার পর দাদু ঘুমে ঢলে পড়লে দাদা ঘরে ঢুকে..." কথা শেষ করার আগেই তীব্র ব্যঙ্গে বেঁকে গেল জিনিয়ার ঠোঁট।

"আপাতভাবে সম্ভব মনে হলেও ব্যাপারটা আমি মানতে পারছি না রে," মাথা নেড়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করল পাখি, "তোর দাদার এখন যা মানসিক অবস্থা, তাতে খুন করার জন্যে একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাবার মতো লং টার্ম প্ল্যানিং, মানসিক স্থৈর্য, রিস্ক নেওয়ার মতো চরিত্রের জোর এসব কিছুই তোর দাদার এখন আর নেই। না রে, সুকল্যাণদা এ কাজ করতেই পারে না।"

"তা হলে পাখি, তুই বলছিস দাদা খুন করেনি!" ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার তাগিদে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমন করেই পাখির হাত চেপে ধরে বলল জিনিয়া, "জয় মা কালী। পাখির কথা সত্যি হলে তোমায় জোড়া পাঁঠা বলি দেব মা। মা গো," কয়েকবার কপালে হাত ঠেকাল জিনিয়া।

"আমরা বোধ হয় ভুল পথে চলেছি রে জিনিয়া। তরুদি, নিবারণকাকা, সুকল্যাণদা, কেউই বোধ হয় এই খুনটা করেননি। করেছে এমন কেউ, যে আমাদের সকলের চোখের সামনেই আছে অথচ তাকে আমরা ধরতে পারছি না।"

"কে সে? তুইও ধরতে পারছিস না?"

"না রে, এক-একবার একটা অস্পষ্ট ছবি যেন ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে," হতাশ দেখাল পাখিকে।

"বুঝেছি, এসব তোর কম্মো নয়। কবে কী ফাঁকতালে একটা কেস সল্‌ভ করে কাগজে ফোটো বের করে ভেবেছিস, তুই একটা ঘ্যামা গোয়েন্দা হয়েছিস। আসলে তো ঢুঁ ঢুঁ। তার চেয়ে বরং চল, কাল দু'জনে মিলিটারিদাদুর বাড়ি যাই। সব কথা খুলে বললে দাদু নিশ্চয়ই একটা উপায় বাতলাবেন," বিজ্ঞ মুখে বলল জিনিয়া।

"তাই চল তবে। আমারও এসব ঝুটঝামেলা আর ভাল লাগছে না। মানে, এবার কলকাতা যেতে পারলে বাঁচি।"

॥ ২০ ॥

ঝোপঝাড়ে ভরা বিশাল মাঠটার বুক চিরে এবড়োখেবড়ো চলার পথটা ধরে এগোতে-এগোতে পাখি বলল, "আর কত দূর? আমার তো হাঁপ ধরে গেল রে।"

"এই তো সামনেই। এসে গিয়েছি প্রায়।"

"তুই তো সেই দশ-পনেরো মিনিট ধরে বলেই চলেছিস, এসে গিয়েছি, এসে গিয়েছি প্রায়।"

"না রে, এবার সত্যি এসে গিয়েছি। এই মাঠটুকু পার হলেই ব্যস, দাদুর বাড়ি। মাঠের কোলে ওই যে তালগাছগুলো দেখছিস, ওরই পিছনে দাদুর বাংলোবাড়ি।"

হাঁটতে-হাঁটতেই আনমনা পাখি বলল, "বাব্বাঃ, এই বয়সে রোজ এতটা পথ ঠেঙিয়ে মিলিটারিদাদু তোদের বাড়ি যান কী করে? আমি হলে তো কবেই পটকে যেতাম।"

"তোর মতো হাড়গিলে চেহারা নাকি দাদুর? হুঁ হুঁ বাবা, হাজার হলেও মিলিটারি মানুষ, ব্যাপারই আলাদা।"

জিনিয়ার কথায় কান না দিয়ে হঠাৎই থমকে দাঁড়াল পাখি। আনমনে কী যেন ভাবল। জিনিয়া তাড়া লাগাল, "কী রে, কী হল তোর? রাস্তার মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লি যে বড়?"

একটা ঘোর থেকে যেন জেগে উঠল পাখি। ঈষৎ হেসে বলল, "নাঃ, একটা ছোট্ট ব্যাপার স্ট্রাইক করল... তাই।"

"ছাড় তো। তোর ছোট-বড় ব্যাপার ছেড়ে এখন আসল কাজে মন দে তো।" বলতে-বলতে পাখির হাত ধরে টান মারল জিনিয়া।

কোকিল-ডাকা ডোরবেল দু'বার বাজাতেই দরজা খুললেন স্বয়ং মিলিটারিদাদু। পাখি আর জিনিয়াকে দেখে শিশুর মতো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেবলই বলতে থাকলেন, "আরে-আরে, কী সৌভাগ্য আমার! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে? লক্ষ্মী, সরস্বতী একেবারে হাত ধরাধরি করে আমার গরিবখানায় হাজির।"

জিনিয়া আর পাখির হাত ধরে দাদু নিয়ে গেলেন ড্রয়িংরুমে। পাশাপাশি দু'টো সোফায় পরম যত্নে বসিয়ে বললেন, "আগে বলো কী খাবে, চিজ-অমলেট, নাকি চিকেন-স্যান্ডুইচ আর গরম-গরম কফি?"

গম্ভীর মুখে পাখি বলল, "আমরা খেতে আসিনি দাদু। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।"

"আরে, খানা আর বাতচিত না হয় একসঙ্গেই হবে, এতে মুশকিলের কী আছে? তোমরা বরং একটু জিরিয়ে নাও, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছ! আমি ততক্ষণে কফিটা নিয়ে আসি," বলতে-বলতে কিচেনের দিকে অদৃশ্য হলেন রণবীর সান্যাল।

ঘুরে-ঘুরে ড্রয়িংরুমটা দেখতে থাকল পাখি। কত রকম মেডেল আর ট্রোফি দিয়ে সাজানো রয়েছে ঘরটা। "খুব ভাল ব্রিজ আর পোলো খেলতেন দাদু, এসব নাকি সেজন্যই পাওয়া। আর

ওই যে ডান দিকের দেওয়ালে মাউন্ট করা বাঘের মাথাটা দেখছিস, ওই বাঘটা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে নাকি দাদুই মেরেছিলেন। এক গুলিতেই নাকি বাঘবাবাজির দফাগয়া হয়েছিল," গাইডের মতো লেকচার দিল জিনিয়া।

"তার মানে, দাদুর হাতের টিপ একস্ট্রাঅর্ডিনারি।"

"সে আর বলতে?"

"আচ্ছা জিনিয়া, বাঘবাবাজির মুন্ডুর পাশে অল্পবয়সি মহিলার যে বড় ফোটোটা, উনি কে? দাদুর মা?"

"দুর। উনি তো দাদুর ছোট বোন। ভাল করে চেয়ে দ্যাখ, বাকি দেওয়ালগুলোতেও ওঁর নানা বয়সের ফোটো টাঙানো। ওই একমাত্র বোন দাদুর নয়নের মণি ছিলেন। খুব অল্প বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলে সারা জীবন আর বিয়ে-থা'ই করলেন না দাদু।"

"তোরা কখনও দেখেছিস সেই বোনকে?"

"না না, আমরা কোত্থেকে দেখব? শুনেছি, কোনও এক মেন্টাল হসপিটালে থাকেন।"

ট্রে ভর্তি খাবারদাবার আর কফি নিয়ে ইতিমধ্যে হইহই করে এসে পড়লেন রণবীর সান্যাল। পাখি আর জিনিয়ার হাতে-হাতে খাবারের প্লেট তুলে দিতে-দিতে বললেন, "হ্যাঁ, এবার বলো কী তোমাদের কথা? এই বুড়োটা আর তোমাদের কী কাজে লাগবে?"

মুখ আঁধার করে জিনিয়া বলল, "দাদু, আমার মনটা ভীষণ খারাপ। আমার আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না।"

"কেন বেটি, কী হল? কে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে? তুমি যদি বলো, তবে পুরনো দিনের নাইটের মতো তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তেও আমি রাজি আছি," চোখ মটকে পরিহাসের গলায় বললেন রণবীর সান্যাল।

"না দাদু, ঠাট্টা নয়," বলতে-বলতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফ্যালে জিনিয়া, "দাদাকে নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তায় আছি। পুলিশ কেন দাদাকে খুনি বলছে? দাদা খুন করেনি। আমি জানি এ কাজ ও করতে পারে না," হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে জিনিয়া, "তুমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলো দাদু যে, দাদা খুন করেনি। এ কাজ ও করতে পারে না। দাদা ছাড়া আমার আর কে আছে বলো? ওর যদি কিছু হয় তবে আমি আর বাঁচব না।"

"জিনিবেটি, কেঁদো না মা আমার। তুমি কাঁদলে এই বুড়োও কিন্তু এবার কাঁদবে, তখন সামলাতে পারবে তো? আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সব কথা আমি পুলিশকে বলব, জরুর বলব। কিন্তু তার আগে তোমার হাসিমুখটা আমায় একটু দেখাও। আমার সঙ্গে মিঠিমিঠি বাত করো, তবে বলব।"

রণবীর সান্যালের আশ্বাসবাণীতে জিনিয়ার মুখের মেঘ অনেকটাই সরে গেল। তারপর একটু-একটু করে গল্পগাছা শুরু হল। বেশিরভাগই রণবীরদাদুর মিলিটারি জীবনের গপ্পো। কত জায়গায় গিয়েছেন দাদু। হাড় হিম করা লাদাখের পাহাড় থেকে শুরু করে রাজস্থানের মরুভূমি। এমনকী নাগাল্যান্ডের ঘন জঙ্গলে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন দাদু লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে আবার অ্যালবাম দেখাও চলল। কাশ্মীর, কন্যাকুমারিকা, আন্দামান, পাঠানকোট, সর্বত্র গিয়েছেন দাদু কাজের সূত্রে আর ফোটোতে-ফোটোতে ভরিয়ে তুলেছেন অ্যালবামের পাতা। ফোটো দেখতে-দেখতে পাখি হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদু, আপনি ফ্রন্টে গিয়েছিলেন কখনও? ইন্দো-পাক ওয়র, ইন্দো-চায়না ওয়রের গল্প বলুন না একটু।"

"দুর পাগলি, ব্যাট্‌লফ্রন্টের গল্প আমি বলব কী করে? আমি তো ছিলাম দিল্লিতে সাপ্লাই ডিভিশনে। চাল, গম, ফুয়েল থেকে শুরু করে আর্মস অ্যামিউনিশন ফ্রন্টে সাপ্লাই করাই ছিল আমাদের কাজ। ওয়র হিরোর মুকুট আমাদের মাথায় কখনও উঠল না রে দিদিভাই।"

রণবীর সান্যালের কথার মাঝেই জিনিয়া হঠাৎ কলকল করে উঠল, "দ্যাখ, দ্যাখ পাখি, দাদুর এই ফোটোটা। বাবাঃ, অল্প বয়সে কী দারুণ হ্যান্ডসাম ছিলেন দাদু," পুরোদস্তুর মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা সহাস্য উজ্জ্বল মুখের এক যুবকের ছবি দেখিয়ে জিনিয়া বলল, "ইস, একদম গ্রেগরি পেকের মতো!"

জিনিয়ার তালে তাল মিলিয়ে রণবীর সান্যাল হাসতে-হাসতে বললেন, "তাও তো আমার এই ফোটোটা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তোলা। তার মানে বুঝতেই পারছ, কুড়ি-পঁচিশে কী ছিলাম!"

ইতিমধ্যে বেডরুমে ফোন বেজে উঠল। রণবীর সান্যাল দ্রুত পায়ে বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। পাখি আর জিনিয়া নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করতে থাকল।

বেডরুম থেকে ফিরে এসে দাদু বললেন, "নটি গার্ল্স, বাড়িতে কিছু না বলেই এখানে পালিয়ে এসেছ, আর ওদিকে বউমা ভেবে-ভেবে অস্থির। শেষে বুদ্ধি করে আমায় ফোন করেছে। আপাতত আজকের আড্ডা এখানেই শেষ। এখন চলো, তোমাদের কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।"

মাঠ ভেঙে যেতে-যেতে নিজের হ্যান্ডব্যাগে রুমাল রাখার ছল করে মিলিটারিদাদুর ইউনিফর্ম পরা ফোটোটা ঢুকিয়ে রাখল পাখি। জিনিয়ার চোখ বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত অ্যালবাম থেকে ফোটোটা যে খুলে আনতে পেরেছে এই রক্ষে। আশা করা যায় খুব শিগগির পাখির এই চালাকি মিলিটারিদাদুর চোখে ধরা পড়বে না।

পথে যেতে-যেতেই পাখি বলল, "অ্যাই জিনিয়া, আজ বিকেলের ট্রেনেই আমি কিন্তু কলকাতা যাব। তুই একটু মেজোকাকাকে বলে ব্যবস্থা করে দে।"

"হঠাৎ কী এমন রাজকাজ পড়ল যে আজই তোকে কলকাতা দৌড়তে হবে?" জিনিয়া রীতিমতো অবাক।

"আছে কিছু কাজ, সব তুই বুঝবি না।" পাখির বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, সে আর কথা বাড়াতে রাজি নয়।

॥ ২১ ॥

থমথমে মুখ নিয়ে দরজা খুলে পাখিকে দেখেও খুব একটা চমকাল না জিনিয়া। কেবল ভারী গলায় বলল, "ভীষণ দরকার বলে কলকাতায় কেটে পড়ে আবার হপ্তা ঘুরতে না-ঘুরতেই উদয় হলি যে বড়?"

জিনিয়াকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে পাখি বলল, "কাজ হয়ে গেল তাই চলে এলাম। তা এদিকের ফ্রন্টে কী খবর? এনি নিউ ডেভেলপমেন্ট? সমাদ্দারদারোগা আর কী-কী নতুন থিওরি ছাড়লেন?"

পাখির কোনও কথারই কোনও জবাব দিল না জিনিয়া। সোফার উপর গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বসে থাকল।

জিনিয়ার রকমসকম দেখে পাখি পাশে বসে মান ভাঙাবার গলায় বলল, "বুঝেছি, তোকে না নিয়ে, কোনও কিছু না বলে কলকাতায় দৌড়েছি বলে গোঁসা হয়েছে মেয়ের। আচ্ছা বাবা, সরি। অন্যায় করেছি, ভুল করেছি। এবারের মতো হুজুর বান্দাকে মাপ করে দিন," রীতিমতো হাত জোড় করে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বলল পাখি।

এত কিছু করেও জিনিয়ার কোনও ভাবান্তর হল না দেখে একটু ঘাবড়েই গেল পাখি। সিরিয়াস মুখে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে জিনি, সকলের শরীরটরির ঠিক আছে তো? কাকিমা, সুকল্যাণদা সকলের শরীর ভাল আছে তো?"

এবার ডুকরে কেঁদে উঠল জিনিয়া। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, "গত পরশু বিকেলে দারোগাবাবু এসে দাদাকে থানায় নিয়ে গেলেন। সেই যে গেল আজ অবধি বাড়ি আসেনি দাদা।"

"বলিস কী? সুকল্যাণদা পুলিশ কাস্টডিতে?" সত্যিই অবাক হয়ে গেল পাখি, "তা মেজোকাকা, রণবীরদাদু এঁরা কিছু বললেন না পুলিশকে? কোন চার্জে সুকল্যাণদাকে নিয়ে গেল পুলিশ? এ কী মগের মুলুক? যা খুশি তাই করবে?"

"কাকাবাবু, মিলিটারিদাদু, কারও কোনও কথাই কানে তুলছে না পুলিশ। তুই একটা কিছু কর, না হলে আমার দাদা পুলিশের অত্যাচারেই মারা যাবে।"

"করতে তো একটা কিছু হবেই। শুধু-শুধু বিনা কারণে একটা নিরীহ নির্দোষ মানুষের উপর এ কী অন্যায় অত্যাচার?" রাগী গলায় কথাগুলো বলতে-বলতে কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে এগোল পাখি।

"তুই কি এখনই থানায় চললি নাকি? তা হলে চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে। তুই এক মিনিট দাঁড়া, আমি বলে আসি কাকিমাকে।"

"থানায় এখনই আমি যাচ্ছি না," ইতস্তত করল বলল পাখি।

"তা হলে চললি কোথায়?" পুলিশি জেরা করেই চলে জিনিয়া।

"যাচ্ছি একবার রণবীরদাদুর বাড়ি, একটা ফোটো ফেরত দিতে," আবার ইতস্তত করল পাখি।

"ফোটো? ফোটো আবার পেলি কোথা থেকে?"

"ফোটোটা রণবীরদাদুরই, ফেরত দেব।"

"তুই যে কী বলছিস, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না রে!" বিপন্ন মুখে জিনিয়া বলল, "কেনই বা দাদুর ফোটো তোর কাছে এল, আর কেনই বা ফোটোটা এখনই ফেরত দিতে ছুটছিস, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।"

"এখন আমার একদম সময় নেই। পরে তোকে সব কথা খুলে বলব," দরজা দিয়ে বেরোতে-বেরোতে পাখি বলল।

"তা হলে চল আমিও তোর সঙ্গে..."

"না জিনিয়া, একদম নয়। এখন আমি একাই যাব, একদম একা," পাখি বলল।

পাখির বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল যাতে জিনিয়া একটু চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত বলল, "বেশ, তুই তবে একাই যা। তবে তাড়াতাড়ি ফিরিস। বাড়িতে একা-একা আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।"

বেলা বারোটার চাঁদিফাটা রোদের তোয়াক্কা না করেই গলগল করে ঘামতে-ঘামতে শেষ পর্যন্ত পাখি গিয়ে হাজির হল রণবীর সান্যালের বাড়ি। অসময়ে পাখিকে দেখে রণবীর সান্যাল রীতিমতো অবাক, "আরে পাখিদিদি, তুমি নাকি জিনিবেটিকে ফেলে টুক করে উড়ে গিয়েছিলে কলকাতায়?"

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা পরিচয়

**গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই**

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

**১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : ২৩৫০-৯৩৫১,২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স্ : ২৩৫০-৯৩৫১**

PRASA -02

"হ্যাঁ গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার একটা জিনিস ফেরত দিতেই আসতে হল।"

"আমার জিনিস তোমার কাছে? বলো কী?"

"হ্যাঁ, আপনার এই ফোটোটা।" বলতে-বলতে ব্যাগ থেকে ফোটোটা বের করে রণবীর সান্যালের হাতে তুলে দিল পাখি।

ফোটোটা হাতে ধরে স্থির দৃষ্টিতে শিকারি যেমন শিকার নিরীক্ষণ করে, তেমনভাবেই পাখির দিকে তাকিয়ে থাকলেন রণবীর সান্যাল। তারপর শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও লাভ হল ফোটোটা নিয়ে?"

"লাভ? তা কিছুটা হল বইকী। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম ও পরে দিল্লিতে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে আমার এক আত্মীয় মারফত বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত জানতে পারলাম যে, আপনি মিলিটারির সাপ্লাই ডিভিশনে কোনও দিনই ছিলেন না। আসলে আপনি ছিলেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে। বিশেষ করে সেভেনটি-ওয়ানের ইন্দো-পাক ওয়রের সময় আপনি যথেষ্ট অ্যাক্টিভ রোল প্লে করেছিলেন।"

"বেশ, বলে যাও," চোখ বুজেই গম্ভীর গলায় বললেন রণবীর সান্যাল।

"ইন্টেলিজেন্সে থাকার সময় শত্রুকে কব্জা করার জন্য আপনাদের এমন কিছু বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়, যা সকলকে দেওয়া হয় না। যেমন শত্রুকে পিছন থেকে অতর্কিতে ঘাড় ও মাথার মাঝখানে যদি সজোরে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে আঘাত করা যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু নিশ্চিত। এই কায়দাটিই আপনি ব্যবহার করেছিলেন ব্রজেনদাদুকে খুন করার ক্ষেত্রে। তবে হাতের বদলে ব্যবহার করেছিলেন দত্তবাড়ির রান্নাঘরের ব্যবহৃত ছুরিটি।"

"তুমি কি বলতে চাইছ, ব্রজেনকে আমিই খুন করেছি? তোমার কি মাথা খারাপ? পুলিশ থেকে শুরু করে ও বাড়ির প্রতিটি লোকই জানে যে, আমরা, মানে আমি আর জিনিয়া ঘরে ঢুকে দেখি ব্রজেন মৃত। আর এখন তুমি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে যা খুশি তাই বললেই হবে? তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে যে, আমিই...?"

"প্রমাণের দায়িত্ব আমার নয়। সেটা পুলিশের ডিউটি," একটুও না ঘাবড়ে শান্ত গলায় বলল পাখি, "আমি শুধু এসেছি এই কেসে আপনার ভূমিকা সম্বন্ধে আমার কিছু সন্দেহ বা খটকার কথা আপনাকে বলতে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও," অসহিষ্ণু গলায় বাধা দিলেন রণবীর সান্যাল, "দ্যাখো পাখি, আমার অনেক জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও অনেকক্ষণ ধরে তোমার এই সব আগডুম বাগডুম শুনছি। কিন্তু না, তোমার এই মিথ্যে মনগড়া সন্দেহ আর খটকার গপ্পোর জন্য বাজে সময় নষ্ট করতে আমি আর রাজি নই," সোফা থেকে উঠতে-উঠতে রণবীর সান্যাল বললেন।

"সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, শুনতে আপনাকে হবেই রণবীরদাদু। নইলে আমি সমাদ্দারদারোগার কাছে যেতে বাধ্য হব। সেখানে কাজ না হলে লালবাজার পর্যন্ত যেতেও আমি রাজি।"

"আরে, অত দৌড়াদৌড়ি তোমায় করতে হবে না। এক-এক করে বলেই ফ্যালো তোমার সন্দেহের আর খটকার কথা," বাঁকা হেসে রণবীর সান্যাল বললেন, "ছোট্ট মাথায় আজগুবি কল্পনার কথা শুনতে না হয় আধঘণ্টা সময় নষ্টই করলাম।"

"ব্রজেনদাদু যে রাতে খুন হন, সে রাতে প্রায় একটা নাগাদ আপনি দত্তবাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, নিবারণকাকা আপনাকে খবর দিয়েছেন যে, ব্রজেনবাবু অসুস্থ। তাই আপনি ছুটতে-ছুটতে দেখতে এসেছেন বন্ধুকে। সাধারণত বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে লোকে আগে বাড়ির লোকেদের জানায়, তারপর ছোটে ডাক্তারের বাড়ি। অথচ এসব কিছুই না করে নিবারণকাকা হঠাৎ ছুটতে-ছুটতে আপনাকে খবর দিতে গেলেন কেন, সেই খটকাটা কিন্তু প্রথম থেকেই আমার ছিল," কথাগুলো বলতে-বলতে পাখি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রণবীর সান্যালের মুখের রেখার কোনও পরিবর্তন হয় কি না লক্ষ করছিল। কিন্তু না, রণবীর সান্যালের মুখমণ্ডল পাষাণফলকের মতোই মসৃণ, নিভাঁজ দেখাল।

"দ্বিতীয়ত, আপনার বাড়ি আর ব্রজেনদাদুর বাড়ির দূরত্ব হাঁটা পথে প্রায় পনেরো মিনিট। আপনার বয়সি একজন মানুষ চরম উত্তেজনা, উদ্বেগ মাথায় নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এই পথটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে পড়বেন, এটাই স্বাভাবিক। অথচ সেদিন রাতে আমি আর জিনিয়া যখন আপনাকে দরজা খুলে দিই, তখন সেরকম কোনও দৈহিক লক্ষণই কিন্তু আপনার মধ্যে দেখিনি। জিনিয়াকে সঙ্গে করে ব্রজেনদাদুর বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি যাওয়ার পথটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে যখন বেশ হাঁপিয়ে পড়লাম, তখনই এই ঘটনাটা আমার মনে আরও জোরদার হল।"

"আরে বাবা, তোমার এই সব খটোমটো খটকা দিয়ে পাখিদিদিমণি তুমি মোটেই প্রমাণ করতে পারবে না যে, ব্রজেনকে খুনটা আমি করেছি," মিটিমিটি হেসে বললেন রণবীর সান্যাল, "তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে, আমি জিনিয়াকে সঙ্গে নিয়েই ব্রজেনের ঘরে যাই। জিনিয়ার সামনে ব্রজেনের পাল্স পরীক্ষা করে বুঝি, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে এবং সকলকে খবর দিতে বলি। তা হলে বলো তো পাখিদিদি, খুনটা আমি কখন, কোথায়, কীভাবে করলাম? না, তোমার যুক্তিপদ্ধতি বড়ই কাঁচা হে, বড়ই কাঁচা। এ দিয়ে রণবীর সান্যালকে কবজা করা যাবে না হে," বলতে-বলতে হো-হো করে হেসে উঠলেন রণবীর সান্যাল।

"দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনি আগেই অতটা নিশ্চিন্ত বোধ করবেন না," একটুও না দমে পাখি বলল, "আপনার বোধ হয় মনে নেই আমি এবং জিনিয়া দু'জনই সে রাতে আপনার সঙ্গে ব্রজেনদাদুর ঘরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যেন কিছুটা জোর করেই আমাকে একতলায় রেখে গিয়েছিলেন এই অজুহাতে, যাতে নিবারণকাকা ডাক্তার নিয়ে এলে আমি সদর দরজাটা খুলে দিতে পারি। জিনিয়ার মতো সোজাসাপটা বা যাকে বলে বোকাসোকা মেয়ে সঙ্গে থাকলে আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধে হবে, সেটা আপনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন।"

"কীসের কাজ? জিনিয়া আর আমি যখন ব্রজেনের ঘরে পৌঁছই তখন কোনও কাজই আর বাকি ছিল না। হি ওয়াজ অলরেডি ডেড, মানে মৃত।"

"আপনি অহেতুক মৃত শব্দটা ব্যবহার করবেন না রণবীরদাদু। কারণ, আপনারা ব্রজেনদাদুর ঘরে যখন যান, তখনও তিনি মারা যাননি। ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মাত্র। জিনিয়ার মতো সহজ সরল মেয়ের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব ছিল না। আপনার অসাধারণ অভিনয়ের ফলে সে ধরেই নিয়েছিল, তার দাদু আর ইহজগতে নেই। হায়, সে যদি জানত তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মিলিটারিদাদুই তাকে কী চরম প্রবঞ্চনা করছেন!"

"তুমি এসব কী হেঁয়ালি করছ বলো তো পাখি! আমি তো তোমার কোনও কথারই কোনও মাথামুন্ডু খুঁজে পাচ্ছি না। নাঃ, এ তো বেশ জ্বালায় পড়া গেল!" যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে বললেন রণবীর সান্যাল।

"ও তাই নাকি, আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না? বেশ, আপনার বোঝার সুবিধের জন্য পুরো ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি," তীব্র দৃষ্টিতে রণবীর সান্যালের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে পাখি বলল, "জিনিয়াকে ঘরের চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে আপনি যখন ব্রজেন দত্তর পাল্স চেক করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন, আসলে তখনও তিনি মারা যাননি। কড়া ঘুমের ওষুধের জন্য একটা গভীর ঘোরের মধ্যে ছিলেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, শ্বাসপ্রশ্বাসও ছিল অতি ক্ষীণ। দূর থেকে একনজরে দেখলে সত্যি মনে হচ্ছিল ব্রজেন দত্ত মৃত। জিনিয়ার মতো সোজা সরল মেয়েও যদি ব্রজেন দত্তর খুব কাছে এসে দাঁড়াত, তা হলে সে হয়তো বুঝে ফেলত, তার দাদু জীবিতই আছেন। সেই ভয়েই আপনি জিনিয়াকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেননি আর আমাকেও একতলাতেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, ঘরে ঢুকে ব্রজেন দত্তর পাল্স চেক করে আপনি এমনভাবে দুঃখে ভেঙে পড়ার অভিনয় করলেন যে, জিনিয়া ধরেই নিল, দাদু আর তাদের মধ্যে নেই। কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে সে যখন সকলকে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখনই মোক্ষম চালটি চাললেন আপনি। পকেট থেকে ছুরিটা বের করে ব্রজেনদাদুর ঘাড় আর মাথার মাঝখানটিতে একেবারে আমূল বসিয়ে দিয়েই আর্তনাদ করে উঠলেন। আপনার হাতের টিপ অসাধারণ বলেই একবারের চেষ্টাতেই আপনি সফল হলেন। অন্যদিকে আপনার আর্তনাদ শুনে জিনিয়া দৌড়ে ঘরে ঢুকতেই আপনি বিমূঢ়, হতভম্ব অবস্থায় কোনওমতে হাত তুলে ব্রজেন দত্তর ছুরিবিদ্ধ দেহটা দেখান। যেহেতু প্রথম থেকেই জিনিয়া ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই তার পক্ষে মনে করা সম্ভব ছিল না যে, সে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় ব্রজেনদাদুকে আগাগোড়াই পড়ে থাকতে দেখেছিল কি না! কিন্তু আপনার উপর তার অগাধ বিশ্বাস থাকায় সে ধরেই নিল যে, আপনারা ঘরে ঢোকার আগেই ব্রজেনদাদু খুন হয়েছেন এবং আপনি হঠাৎ করেই এই খুনের ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছেন। আপনার আশ্চর্য বুদ্ধির জোরে আপনি এক ঢিলে দু'টো পাখিই মেরে একেবারে কিস্তিমাত করে দিলেন। প্রথমত, আপনি পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে সাজালেন যাতে প্রমাণ হল যে, খুনটা আর যেই করে থাকুক, আপনি করেননি। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আপনারা ব্রজেনদাদুর ঘরে ঢুকেছিলেন সওয়া একটা নাগাদ, সকলে ধরে নিল, খুনটা নিশ্চয়ই তার আগেই অন্য কেউ করেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও খুনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল রাত এগারোটা থেকে দু'টোর মধ্যে। ফলে পুলিশও ধরে নিল যে, এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে অর্থাৎ আপনি আর জিনিয়া ব্রজেন দত্তর ঘরে ঢোকার আগেই তিনি খুন হয়েছেন। সত্যি, জবাব নেই আপনার। বন্ধুর ভালবাসা, আর-একটা সোজা সরল মেয়ের অগাধ বিশ্বাসের কী মূল্যই না দিলেন আপনি!"

"বাঃ বাঃ চমৎকার। তোমার কল্পনাশক্তির তারিফ না করে পারছি না," হাততালি দিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন রণবীর সান্যাল, "তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানোর কাজটিও কি আমিই করেছিলাম?"

কৌতুক মেশানো চোখে পাখির দিকে তাকালেন রণবীর সান্যাল।

"হ্যাঁ, সেটাও আপনারই কাজ। তরুদি যখন কফির কাপ নিয়ে ব্রজেনদাদুর ঘরে যায়, তখন সেখানে কেবলমাত্র আপনারা দু'জনেই ছিলেন। দত্তবাড়িতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগে ও বাড়ি থেকে কিছু ঘুমের ওষুধ সরানো আপনার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আর সেই ঘুমের ওষুধই ব্রজেনদাদুর চোখ এড়িয়ে কফিতে মিশিয়ে দিতেও খুব একটা অসুবিধে আপনার হয়নি।"

"আমি যদি খুনই করব তবে আবার ঘুমের ওষুধ দেব কেন হে? নাঃ, ব্যাপারটা তুমি একেবারে জোলো কাঁচা রহস্য গল্প করে ফেলছ দেখছি।"

রণবীর সান্যালের ব্যঙ্গোক্তি উপেক্ষা করে পাখি বলেই চলল, "ঘুমের ওষুধটা আপনি দিয়েছিলেন দু'টো কারণে। এক, ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় ব্রজেনদাদু যাতে খুনের সময় চেঁচামেচি করে কোনও প্রতিরোধ করতে না পারেন। কারণ, ব্রজেনদাদু চেঁচামেচি করলে খুনের সময়টা কেউ না-কেউ হয়তো ধরে ফেলত। সেটা আপনার পক্ষে খুবই মুশকিলের হত। তা ছাড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে আপনি একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আপনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ব্রজেনদাদুর হত্যারহস্যের সঙ্গে এক নয়,

একাধিক মানুষ জড়িত আছে, যারা ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্রজেনদাদুকে হত্যা করতে চেয়েছিল। পুলিশকে নাস্তানাবুদ করতে আপনার এই স্ট্র্যাটেজির প্রশংসা করতেই হয়। ইন ফ্যাক্ট, পুলিশ তো আজ অবধি ধরতেই পারেনি যে, গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে একাধিক নয়, কেবলমাত্র একটি লোকের নিখুঁত পরিকল্পনা, আশ্চর্য অভিনয় ও মিথ্যা বিবৃতির উপর।"

"তোমার সব কথার শেষে আমি আবারও বলব যে, এগুলোর কোনওটাই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। যাক, আন্দাজে ঢিল ছোড়া তো অনেক হল, এবার থামো," কেটে-কেটে বললেন রণবীর সান্যাল।

"অকারণে আর কত মিথ্যে বলে নিজেকে আড়াল করবেন রণবীরদাদু? আপনি নিজেও জানেন, আমার প্রতিটি কথাই অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। শুধু আপনার কাছে একটাই প্রশ্ন, এত বছরের ঘনিষ্ঠতম, একমাত্র বন্ধুকে এভাবে খুন করতে আপনার হাত একবারও কাঁপল না?"

নিস্তব্ধ ড্রয়িংরুমে পাখির প্রশ্নটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বাজতে থাকল। রণবীর সান্যাল পাখির কোনও কথার জবাব দিলেন না। শুধু নিজের সোফা থেকে উঠে দেওয়ালে টাঙানো বোনের ফোটোর সামনে দাঁড়ালেন। এক দৃষ্টিতে ফোটোটা দেখতে-দেখতে বললেন, "আমার এই বোনটা জানো, সারাজীবন একটুও শান্তি পায়নি। অথচ ও তো কারও কোনও ক্ষতি করেনি। তবে লোকে কেন ওকে একটু শান্তি দিল না? শোকে, দুঃখে বোনটা আমার পাগল হয়ে গেল।"

অবাক না হয়ে পারল না পাখি। এরকম একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে মিলিটারিদাদুর এই অসংলগ্ন কথাবার্তার কোনও মানেই খুঁজে পেল না সে। পরে ভাবল, হয়তো দাদু তার প্রশ্নের জবাব দেবেন না বলেই ইচ্ছে করে এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু উত্তরটা তাকে জানতে হবেই। এখন না হোক, পরে অন্য কোনও সময় পাখি সঠিক উত্তরটা জানবেই। আপাতত পা টিপে-টিপে পাখি বেরিয়ে এল রণবীর সান্যালের ড্রয়িংরুম থেকে।

॥ ২২ ॥

ভোরের শিরশিরে হাওয়াটা চেষ্টা করেও বিশেষ ক্ষতি করতে পারল না। হাত বাড়িয়ে গায়ের চাদরটা টেনে নিতেই সকালের ঘুমটা একেবারে মিষ্টি দইয়ের মতো নিখুঁত জমে গেল। কিন্তু জিনিয়াটা এমন পাষণ্ডের মতো করতে লাগল যে, কহতব্য নয়। পাখির কানের কাছে প্রায় মাইক নিয়ে তারস্বরে শুরু করল, "অ্যাই পাখি, আর কতক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকবি? মা কিন্তু দু'বার জলখাবার নিয়ে ঘুরে গিয়েছেন। এরপর হাইকমান্ড খেপে গেলে কিন্তু সারাদিন নির্জলা উপোস।"

উপোসের নাম শুনেই বোধ হয় পাখি আর কথা না বাড়িয়ে ধড়মড় করে খাট থেকে নেমে ভাল মেয়ের মতো টুথব্রাশ নিয়ে বাথরুমের দিকে রওনা হল। চোখেমুখে জল দিয়ে, দাঁত মেজে ফ্রেশ হয়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে সবে চুলটা ঠিক করতে যাবে, হঠাৎ নজর পড়ল আয়নার সামনে পাখির নাম লেখা পেটমোটা সাদা খামটার দিকে।

একটু অবাকই হল পাখি। ই-মেল, মোবাইলের যুগে কে আবার তাকে আদ্যিকালের মতো চিঠি পাঠাল!

খামটা হাতে নিয়ে জিনিয়ার দিকে ফিরে ভুরু নাচিয়ে পাখি বলল, "আখির মামলা কেয়া হ্যায় জি?" তারপর খামটা একটু উলটেপালটে বলল, "পোস্টঅফিসের কোনও ছাপও তো দেখছি না রে!"

"দেখবি কী করে? চিঠিটা তো মিলিটারিদাদু পাঠিয়েছেন চৌকিদার রাজেনকে দিয়ে," হাতে নেলপলিশ পরতে-পরতে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জিনিয়া বলল।

রীতিমতো চমকে উঠল পাখি। মুখবন্ধ খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়তে-ছিঁড়তে চিন্তিত গলায় বলল, "মিলিটারিদাদুর চিঠি! আমাকে? কী ব্যাপার!" তারপরেই সাদা কাগজের গোছার মধ্যে দ্রুত ডুব দিল পাখির দু'চোখ।

স্নেহের পাখিবিটি,

"যতক্ষণে এই চিঠি তুমি পড়বে ততক্ষণে আমি তোমাদের সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজ চলে যাওয়ার আগে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ব্রজেন দত্তকে খুন আমিই করেছিলাম। আমার এই স্বীকারোক্তি নিশ্চয়ই ফুলের মতো সুন্দর ছোট্ট মেয়ে জিনিয়া এবং তোমারও অন্তর ঘৃণায় ভরিয়ে দেবে। জিনিয়া ভাববে, কী করে পারলেন মিলিটারিদাদু এই জঘন্য, ঘৃণ্য কাজ করতে? নিজেরই প্রিয় বন্ধুকে এত নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে?

"এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে ফিরে যেতে হবে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথায়। আমি তখন সবে সাব মিলিটারিতে জয়েন করেছি। নতুন কাজ, নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে বড় আনন্দের ছিল সেই সব দিন। আপনার বলতে ছিল এক বোন। বড় সাধ করে দেখেশুনে ভাল ঘরে-বরে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কপাল মন্দ তার। পাঁচ বছর যেতে না-যেতেই মাথার সিঁদুর মুছে, ছেলে কোলে আমার শূন্য ঘরে ফিরে এল সে। তখন থেকে সেই ছেলেই হল তার একমাত্র অবলম্বন, গোটা দুনিয়া। বোনের মুখ চেয়ে সাধ্যের অতীত করে সেই ছেলেকে বুকে ধরে মানুষ করেছি, ভাল স্কুল-কলেজে পড়িয়েছি। ভাল রেজাল্টের জোরে এক সময় নামী সরকারি ব্যাঙ্কে বড় অফিসারের চাকরিও হল তার। কিন্তু এত সুখ বোধ হয় আমার বোনের কপালে লেখা ছিল না।

"তাই বছর পাঁচেকের মধ্যেই জালিয়াতের এক মিথ্যে মামলায় আমার বোনপোকে ফাঁসাল তারই কিছু সহকর্মী। সরকারের সঙ্গে মামলা চলল দীর্ঘদিন। বোনের যৎসামান্য গয়না ও আমার ঘটিবাটি বেচে সেই মামলার খরচ চালিয়েছি দিনের পর-দিন। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। মামলার ফল বেরোলে দেখা গেল, আমার বোনপোর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। আর আসল অপরাধীরা বেকসুর খালাস। এই অন্যায়, অন্যায্য বিচার যিনি করেছিলেন তিনি কে জানো? তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ব্রজেন দত্ত। পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এই অন্যায় বিচার করে দু'টো নিরাপরাধ জীবন চিরকালের জন্য শেষ করে দিলেন। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আমার বোনপো সুইসাইড করল। আর আমার বোন, সারাটা জীবন দুর্ভাগ্য যাকে তাড়া করেছে, একমাত্র সন্তানকে এভাবে হারিয়ে শোকে, দুঃখে সে হতভাগিনী একেবারে উম্মাদ হয়ে গেল। আমার যাযাবরের মতো

চাকরি জীবনে সে উন্মাদিনীর স্থান হবে না বুঝেই এক উন্মাদাশ্রমেই রেখে এলাম তাকে। চলে আসার সময় আকাশ বাতাস সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই ঘোর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত ব্রজেন দত্তকে নিজের জীবন দিয়ে করতে হবে।

"সেই শুরু হল আমার ব্রজেন দত্তকে নিরন্তর অনুসরণের পর্ব। সুপ্রিম কোর্ট থেকে রিটায়ারের পর সে দিল্লিতে বাড়ি করল। আমিও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দিল্লিতে এসে বসলাম। বড় ছেলে ও পুত্রবধূর মোটর অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর পর ব্রজেন যখন শহুরে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিক্রমগড়ে থিতু হয়ে বসল, তখন আমিও তাকে অনুসরণ করে বিক্রমগড়ে তারই প্রতিবেশী রূপে থাকতে শুরু করলাম। তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করার বিরুদ্ধে ছিলাম আমি। ব্রজেনকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতেও রাজি ছিলাম আমি। তা ছাড়া একটা অন্য বাধাও ছিল, আমার উন্মাদিনী বোন। ব্রজেনকে শিক্ষা দিতে গিয়ে আমার ভালমন্দ কিছু হলে সে হতভাগিনীর কী হবে? পৃথিবীতে তো সে একদম একা। ভগবান সে ব্যবস্থাও করলেন। গত চার মাস আগে সে হতভাগিনী সব জ্বালা জুড়িয়ে চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। আর আমার কোনও বাধা রইল না। সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমি কেবল ঠান্ডা মাথায় সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম এক চরম অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে।

"শেষ পর্যন্ত সুযোগ এল। ব্রজেনের নামে হারিয়ে যাওয়া চেকটার ঘটনাটাই ছিল সেই সুযোগ। ব্রজেনদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগে এক ফাঁকে সকলের চোখ এড়িয়ে চেকটা আমিই সরিয়েছিলাম। আসানসোলবাসী আমারই এক বন্ধুর ছেলেকে দিয়ে চেক ভাঙিয়ে টাকাটা তুলে প্লাস্টিক প্যাকেটে ভাল করে মুড়ে আমার বাড়ির ছাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কে ফেলে রেখেছিলাম। পরে এই টাকাটা নিবারণ অথবা মিহির বা সুধীরই চুরি করেছে, ক্রমাগত এই কথা ব্রজেনের কানের কাছে বলে তাকে উসকাতে লাগলাম, যাতে সে এদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

"অন্য দিকে নিবারণকে চুপিচুপি ডেকে বললাম যে, ব্রজেন সন্দেহ করছে নিবারণই চেকটা চুরি করেছে এবং এই অপরাধে যে-কোনও দিন তার চাকরি চলে যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে বিনাদোষে হঠাৎ করে চাকরি চলে গেলে খাবে কী? এই আশঙ্কায় সহায়সম্বলহীন, নিরীহ গোবেচারা নিবারণ যখন কেঁদে আকুল, তখন আমিই তাকে দেরাদুনে এক বন্ধুর বাড়িতে চাকরি করে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিই। তবে তাকে সাবধান করে দিই, ভুলেও যেন সে একথা দত্তবাড়িতে কাউকে না জানায়। ব্রজেনের বাড়িতে জলসার দিন আমিই নিবারণকে টাকা দিই ও বলি, রাত আটটা নাগাদ বাড়ির সকলে যখন আমোদে-আহ্লাদে মত্ত থাকবে, তখন সে যেন নিঃশব্দে সকলের চোখ এড়িয়ে একেবারে আসানসোলে গিয়ে বাস ধরে দুর্গাপুরের, দুর্গাপুর থেকে কলকাতা, তারপর কলকাতা হয়ে দেরাদুনে যায়।

"আমি যা আন্দাজ করেছিলাম তাই হল। নিবারণ চলে যাওয়ার ঘটনাটি কেউই খেয়াল করেনি। যদিও পরে আমি দারোগাবাবুর কাছে মিথ্যে করে ব্রজেন দত্তর উপর নিবারণের আক্রোশের ঘটনাটি বলে নিবারণের পালিয়ে যাওয়ার একটা মোটিভ তৈরি করেছিলাম।

"যাই হোক, জলসার রাতে খাওয়াদাওয়ার সময় আমিই এক ফাঁকে ব্রজেনকে বলি, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। চলো, কফি খেতে-খেতে তোমার ঘরে বসে কথাবার্তা বলি।

"তরু কফি নিয়ে ঘরে রেখে এলে ব্রজেনের চোখ এড়িয়ে কফিতে আমিই মিশিয়েছিলাম ঘুমের ওষুধ। ব্রজেনের টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমি আগেই সরিয়েছিলাম সেই ওষুধ। যাই হোক, কফি খেতে-খেতে তাকে মিথ্যে করে বললাম যে, মিহির তলায়-তলায় সানফ্লাওয়ারকে সাবোতাজ করছে, এ খবর আমি পেয়েছি। টাকার লোভে সানফ্লাওয়ারের এনিমি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছে। এ ধরনের খবরের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না ব্রজেন। ব্যবসার জগতে মিহিরই ছিল তার দাঁড়াবার লাঠি। আমার খবরে সে একদম ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। দু' হাতে মুখ ঢেকে সে কেবলই বলতে থাকল, 'আমার সাধের বাগান উজাড় হয়ে গেল। মিহির, সুধীর, সুকল্যাণ, নিবারণ, সকলে কেবল টাকাটাই চিনল। আমার কথাটা কেউ একবার ভাবল না। আমার বিন্দু-বিন্দু রক্তে গড়ে তোলা সানফ্লাওয়ার আমারই চোখের সামনে এরা শেষ করে দিল। এই দেখার জন্য আর কেন আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ ভগবান?' ব্রজেনের এই রিক্ত, নিঃস্ব চেহারাটা দেখতে-দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল, এত দিনে আমার হতভাগিনী বোনটার আত্মা হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে। ইতিমধ্যে তরু এসে কফির কাপগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আমিও ব্রজেনকে বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

"এর পরের সব ঘটনাই তোমার জানা। তাই নিছক পুনরাবৃত্তিতে আমি আর যাচ্ছি না। তোমার গোয়েন্দা হিসেবে কৃতিত্বের কথা আগেই পড়েছিলাম কাগজে, তবে তোমাকে তা বুঝতে দিইনি। তবে তুমি যাতে কিছু বুঝতে না পার, তাই তোমাকে একতলায় দাঁড় করিয়ে জিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেনের ঘরে গিয়েছিলাম তাকে শেষ করতে। আর তোমায় বলেছিলাম, নিবারণ ডাক্তার নিয়ে এলে সদর দরজা খুলে দিতে। অবশ্য এত করেও শেষরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত জয় হল পাখিরই।

"হ্যাঁ, আর-একটা কথা। তরুকে মাসে-মাসে ব্রজেন যে টাকা দিত সেটা তার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছেলের দেখাশোনার জন্য। কথাটা কোনও এক সময় ব্রজেনই বলেছিল আমাকে। প্রসঙ্গত, লাখ টাকার বান্ডিলটা আমার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে তার একটা অংশ তরুর ছেলের চিকিৎসার জন্য খরচ হলে ব্রজেন দত্তর পাপের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে বলে মনে করি।

"আজ এই পর্যন্ত। যদি পার, তুমি ও জিনিয়া আমাকে ক্ষমা কোরো। ফুলের মতো মেয়ে জিনিয়া যদি তার মিলিটারিদাদুর জন্য দু' ফোঁটা চোখের জলও ফ্যালে, জানব সেই আমার পরম পাওয়া। তবে কী জানো পাখিদিদি, আজ যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে, একটা অন্যায় দিয়ে আর-একটা অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না। বন্ধুত্বের শেষ পরিণতি কিন্তু শর্তহীন অকুণ্ঠ ভালবাসা ও সহমর্মিতা। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমাদের দু'জনের জীবনে তা যেন চিরদিন অমলিন, অক্ষুণ্ণ থাকে।"

ইতি
চির শুভার্থী
রণবীর সান্যাল

চোখের কোল দু'টো ভাল করে মুছে চিঠিটা হাতে নিয়ে নীরবে বসেই থাকল পাখি। পাশ থেকে কত কী বলে গেল জিনিয়া। কিন্তু একটা কথাও কানে গেল না পাখির।

(সমাপ্ত)

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

একজন ভদ্রমহিলা বেশ কিছুদিন অসুস্থ, একেবারে শয্যাশায়ী বললেই চলে! এমন কোনও অসুখ নেই, যা তাঁর হয়নি। ডাক্তাররা তো ধরেই নিয়েছেন, এ যাত্রায় তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। এবার তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ঈশ্বর বললেন, "তুমি কী চাও?"

ভদ্রমহিলা কাতর গলায় বললেন, "প্রভু, আমি অনেক দিন বাঁচতে চাই। আমার অনেক শখ আছে। আমি সেসব শখ পূরণ করতে চাই!"

ভদ্রমহিলার দুঃখ দেখে ঈশ্বর শেষমেশ রাজি হলেন। পরের দিন থেকেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আনন্দে তিনি প্রথমেই গেলেন জিমে, রোগা হওয়ার জন্য। তারপরই ছুটলেন বিউটি পার্লারে। সেখান থেকে মেকওভার করে বেরিয়ে যে-ই না রাস্তায় পা রাখলেন, অমনই একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারল তাঁকে। প্রাণ হারালেন ভদ্রমহিলা। মৃত্যুর পর একরাশ ক্ষোভ নিয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেন তিনি, "ডাক্তারদের উপর না হয় ভরসা করা যায় না, কিন্তু এবার থেকে কি আপনাকেও ভরসা করতে পারব না? আমায় মেরে ফেললেন যে বড়?"

ঈশ্বর বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে একটু দুঃখিত স্বরে বললেন, "আসলে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।"

বিমলবাবু খুব হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ডাক্তারবাবু। আমি যে পেনটা দিয়ে লিখি, সেটা গিলে ফেলেছে আমার ছেলে!"

ডাক্তারবাবু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা এত ব্যস্ত হওয়ার আছেটা কী!"

বিমলবাবু অবাক, "মানে?"

খুব শান্ত স্বরে ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি যতক্ষণ না গিয়ে পৌঁছচ্ছি, ততক্ষণ আপনি একটা পেনসিল দিয়ে লিখুন।"

টিটো আর তাতান অনেক দিন পর একসঙ্গে বসে গল্প করছে। তাতান টিটোকে দেশবিদেশের গল্প শোনাতে-শোনাতে হঠাৎ বলল, "আচ্ছা ধর, কোনও দেশের লোক যদি 'মাসি'কে 'মাম' বলে ডাকে, তা হলে বল তো, ওরা বড়মাসি আর ছোটমাসিকে কী বলে ডাকবে?"

টিটো অনেক চিন্তা করেও উত্তরটা দিতে পারল না।

তাতান মুচকি হেসে বলল, "কেন, ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম!"

মিষ্টু এক দিন স্কুল থেকে ফিরেই ভাইকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই তুই জানিস, পোলো বিয়ারদের পছন্দের খাবার কী?"

প্রশ্ন শুনে ওর ভাই অবাক হয়ে বলল, "আমি কী করে জানব?"

"এটাও জানিস না? আইসবার্গার!"

সেদিন স্কুলে তিন্নিকে ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, হাতিদের কোথায়-কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?"

একটুও না ভেবে তিন্নি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "হাতিদের আবার খুঁজে পাওয়ার কী আছে ম্যাডাম? ওরা এত বড় যে হারিয়ে যেতেই পারে না!"

অর্থ শেখো

‘আবোলতাবোল’ বইটা পড়েনি, এমন কেউ আছে নাকি? সুকুমার রায়ের এই বইটিতে প্রচুর মজাদার শব্দ রয়েছে। নীচের শব্দগুলো সেখান থেকেই নেওয়া। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। পরে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

বিলকুল: (১) কিছুটা, (২) বিলক্ষণ, (৩) সম্পূর্ণ, (৪) বিলম্বিত।

পাগলপারা: (১) উন্মাদনা, (২) পাগলামি, (৩) পাগল করা, (৪) পাগলের মতো।

ডানপিটে: (১) মারকুটে, (২) দুর্দান্ত, (৩) গোঁয়ার, (৪) শক্ত শরীর।

ছিঁচকাঁদুনে: (১) যে সারাদিন কেঁদে বেড়ায়, (২) ছুঁলেই যে কাঁদে, (৩) যার কান্না শুনে সবাই ছি-ছি করে, (৪) যার সব সময় কাঁদতে ভাল লাগে।

গন্ধগোকুল: (১) গন্ধতেলবিশেষ, (২) গন্ধমাদন, (৩) গন্ধমূষিক, (৪) খটাশ।

গত সংখ্যার উত্তর

চীর: (৩) ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। যেমন, ‘চলিলা সন্ন্যাসী ত্যাজিয়া নগর ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর।’ (রবীন্দ্রনাথ)

বান্দা: (২) ভৃত্য। যেমন, ‘খোদার বান্দা ইনসান (মানুষ) যেই নাই তার নিস্তার।’ (মোহিতলাল মজুমদার)

ধান্দা: (১) কাজ। যেমন, ‘তারপর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত।’ (পরশুরাম)

ধ্রুব: (৩) নিশ্চিত। যেমন, ‘কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।’ (রবীন্দ্রনাথ)

আস্য: (৩) মুখ। যেমন, ‘সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ শিখায় মেলিল বিপুল আস্য।’ (রবীন্দ্রনাথ)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) লোকটির মাথার চুল কম। (২) লোকটির একটা দাঁত নেই। (৩) লোকটির মাথার কাপড়ের অংশ দেখা যাচ্ছে না। (৪) মাটিতে একটি মোহর কম। (৫) পাখিটার চোখ উপরে উঠে গিয়েছে। (৬) কুড়ুলটার হাতলটি ছোট। (৭) ডান দিকে নীচে একটি ঝোপ কম। (৮) বাঁ দিকের গাছের একটি ডাল কমে গিয়েছে।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) পড়াশোনা। (৩) ঘোর কালো, কুচকুচে কালো। (৫) কানাইয়ের বড় ভাই। (৭) ঘর, কক্ষ। (৯) আগুনে পোড়া, জ্বলন। (১০) লজ্জা, কুণ্ঠা। (১১) শ্রমিক, মেহনতি মানুষ। (১২) নক্ষত্র, যারা সারারাত আকাশে ঝিকমিক করে। (১৪) নিষেধ, হাতি। (১৬) অনায়াসে বা বিনা কষ্টে করা যায় এমন। (১৭) বদলে, তার চেয়ে। (১৮) মানুষ, নর। (২০) যেখানে নাটক অভিনীত হয়। (২১) বঙ্গে এই সময়টিতে লেপ, কাঁথা গায়ে দিতে হয়।

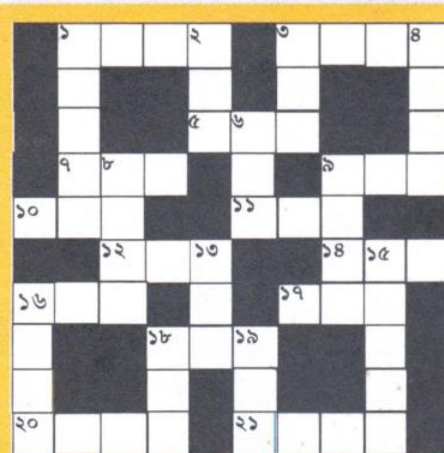

সংকেত: উপর-নীচ

(১) যা মানুষের পতনের কারণ। (২) কোনও প্রদেশের মুসলমান শাসক। (৩) ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি গিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন। (৪) মানুষজন, নানা লোক। (৬) ঘোড়ার বল্‌গা। (৮) এঁর স্মৃতিসৌধ বিখ্যাত তাজমহল। (৯) সভা। (১৩) আগেকার দিনের যুদ্ধে এটি একটি বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল। (১৫) যে আতশবাজিতে উজ্জ্বল ও রঙিন আলোর ফুলকি বেরোয়। (১৬) আমগাছ। (১৮) ফুলের বাগান। (১৯) বাঁশি।

দেবসেনাপতি

■	■	ম	ত	ল	ব	■	অ	লী	ক
প	র	খ	■	জ্জা	■	■	জা	■	র
ব	■	ম	শু	ক	■	অ	না	মি	কা
ন	ক	ল	■	র	স	না	■	■	■
■	ল	■	গু	■	■	হা	কি	ম	■
■	স	মা	প্ত	■	■	র	■	জী	■
■	■	■	ধ	ম	ক	■	দ	র	দ
চ	ন	ম	ন	■	বি	চা	র	■	খ
র	■	ন্দু	■	■	রা	■	কা	হি	ল
ম	য়	রা	■	রো	জ	গা	র	■	■

আনন্দমেলা = পাতায় পাতায় খেলাধুলো + অ্যাডভেঞ্চার।
রহস্য + রোমাঞ্চ। কমিকস, কুইজ়, গল্প, কল্পবিজ্ঞান...
সব মিলিয়ে সারাবেলা জমজমাট। ঠিক তোমার মনের মতন।
আজই আনাও

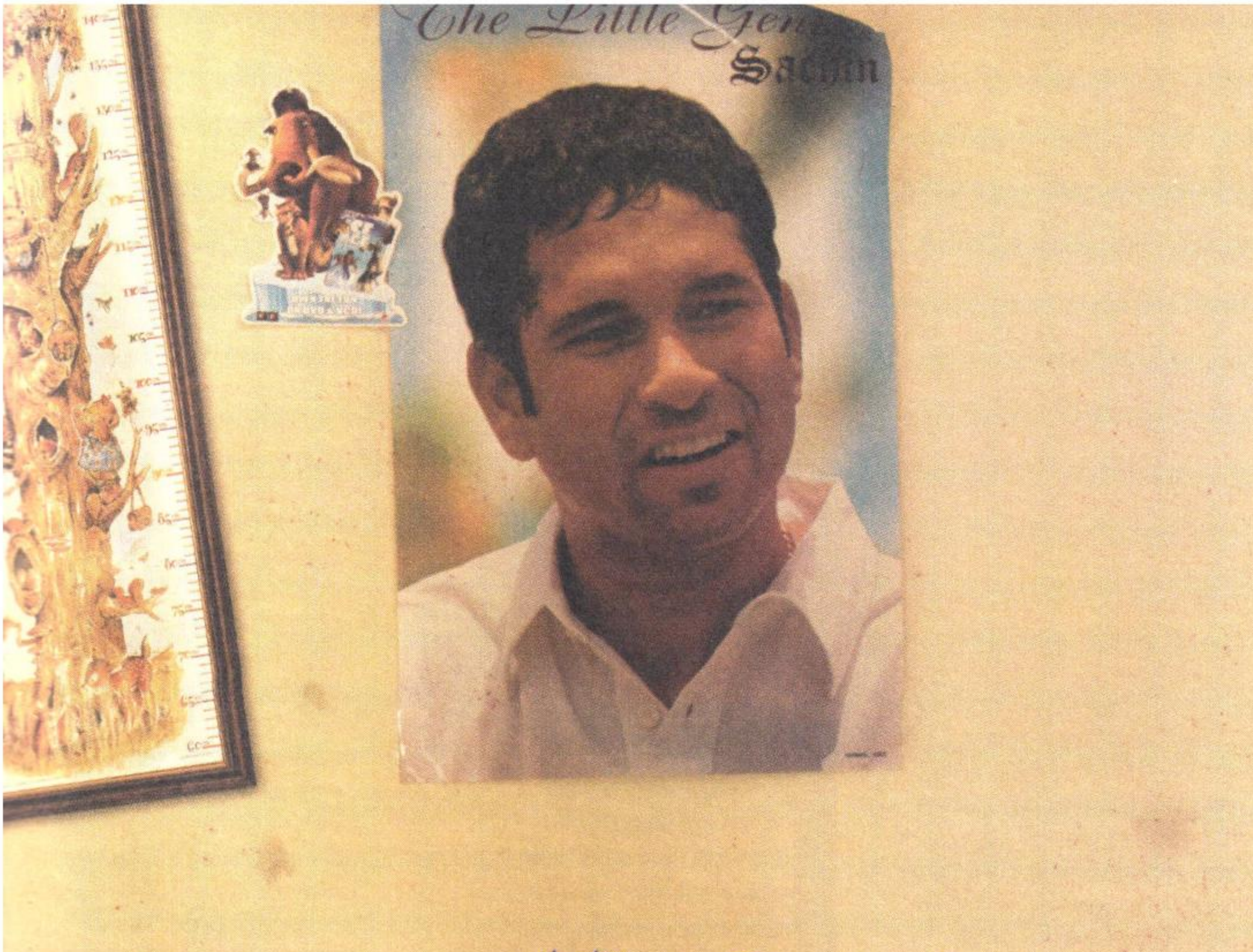

আনন্দমেলা
দেদার দস্যিপনা, জমাটি মজা।

কু ই জ়

হাসি না থাকলে আমাদের জীবনটা কেমন পানসে হয়ে যেত! আমাদের যাঁরা প্রাণখোলা হাসি উপহার দিয়েছেন, তাঁদের নিয়েই এবারের কুইজ়।

১ সম্রাট আকবরের রাজসভায় 'নবরত্ন'দের অন্যতম ছিলেন তিনি। আসল নাম মহেশ দাস। 'ব্রহ্মা' ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। কে এই হাস্যরসিক মানুষটি?

২ কম্পিউটারে আমরা যে 'স্মাইলি' বা 'ইমোটিকন' ব্যবহার করি, তার স্রষ্টা কে?

৩ বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী কার হাসিতে ৮৩ শতাংশ খুশি, নয় শতাংশ বিরক্তি, ছ' শতাংশ ভয় এবং দুই শতাংশ রাগ লুকিয়ে রয়েছে?

৪ বাংলা রম্যসাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম এই লেখক জীবনের শেষ ৬০ বছর কাটিয়েছিলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের এক মেসে। তিনি বলতেন, "এই মুক্তারামের তক্তারামে শুয়ে শুক্তোরাম খেয়ে শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেব।" ঘরের দেওয়াল জুড়ে প্রয়োজনীয় সব ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে রাখতেন। কে ইনি?

৫ হাসি সম্পর্কে বিখ্যাত এই অভিনেতার বক্তব্য ছিল 'আ ডে উইদাউট লাফটার ইজ় আ ডে ওয়েস্টেড।' কে এই অভিনেতা?

৬ কোন রাসায়নিককে বলা হয় 'লাফিং গ্যাস'?

৭ বাংলা চলচ্চিত্রের কোন কমিক অভিনেতার আসল নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়?

৮ হাসির ভয় বা 'ফিয়ার অফ লাফটার'কে কী বলা হয়?

অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

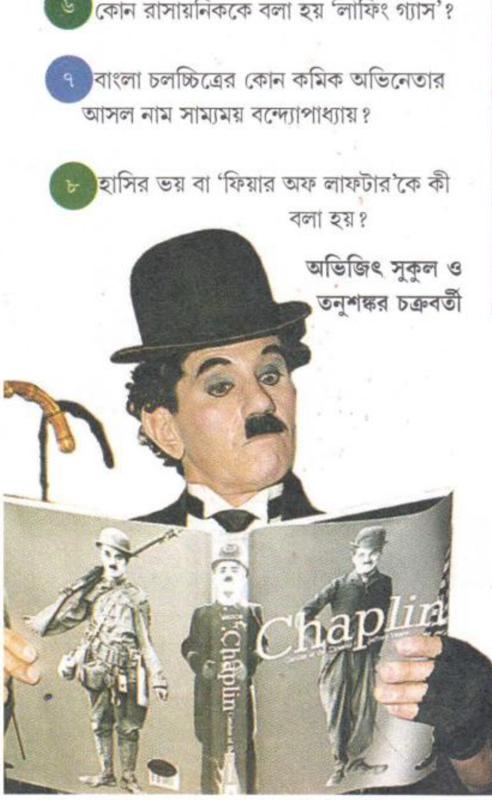

গত সংখ্যার উত্তর

১. অসম।
২. মার্ক টোয়েন, টম সোয়্যার।
৩. ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, জার্মানি।
৪.হ্যারিয়েট বিচার স্টো-র 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন'।
৫. জাক দেরিদা।
৬. ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. গ্রুশো মার্কস।

জবাব চাই

১. সুকুমার রায়ের কবিতা অনুযায়ী হাসির কথা শুনলেই কারা বলত, "হাসব না-না, না-না"?

২. স্ট্যান — এবং অলিভার — ছিল এক বিখ্যাত কমিক-জুটি। শূন্যস্থানে কী বসবে?

৩. নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিখ্যাত বিদূষকের নাম কী?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১.বাইবেল ২. নেলসন ম্যান্ডেলা
৩. সলমন রুশদি

সঠিক উত্তরদাতা

উজ্জয়ন্ত ভৌমিক, ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন; **দীপাঞ্জন দত্ত**, অষ্টম শ্রেণি, দিলীপকুমার বিদ্যালয়, বাদুড়িয়া; **সৃজন নন্দ**, সপ্তম শ্রেণি, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল; **শুভজ্যোতি মুখোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **ময়ূখ ভট্টাচার্য এবং মোহর ভট্টাচার্য**, উত্তরপাড়া চিলড্রেন্স ওন হোম, হুগলি; **দেবনীল সরকার**, পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়**, ষষ্ঠ শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **প্রসেনজিৎ সামন্ত**, ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **আনন্দরূপ চক্রবর্তী, অমিত বিশ্বাস, সাহেব ভট্টাচার্য, ত্রিদিব গুহ**, ষষ্ঠ শ্রেণি, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির, দমদম পার্ক; **তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস**, অষ্টম শ্রেণি, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি; **শঙ্খদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**, পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যাপীঠ, সোনারপুর; **পলাশ রায়**, সপ্তম শ্রেণি, পাণ্ডুয়া শশিভূষণ সাহা উচ্চ বিদ্যালয়; **তন্ময় মল্লিক**, দ্বাদশ শ্রেণি, বাগদহ উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা; **তিথি কর**, মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা; **ঋতম্ভরা দত্ত**, নবম শ্রেণি, রহড়া ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, **শমীক দত্ত**, স্প্রিংডেল হাই স্কুল, কল্যাণী; **চৈতালি রায়**, নবম শ্রেণি, নবব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪

পরগনা; সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়, নবম শ্রেণি, ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল, দমদম; **দেবাশ্রিতা সরকার**, পঞ্চম শ্রেণি, বিদ্যাভারতী গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

বিজলি বালক

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পথটা ছিল নির্জন। সেই পথ ধরে বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটছিল সুদর্শন। ভীত ও সতর্ক নজরে সে তাকাচ্ছিল দু'পাশে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের স্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল তার।

সন্ধে হয়-হয়, রাতের অন্ধকার চারদিকে নেমে আসছিল ঘন কুয়াশার মতো, তাই এত তাড়া। আর কিছুটা পথ বাকি, তার পরেই শহরের সীমানা। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কোনও ভয় নেই, নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে রাতের জন্য। নিশ্চিন্ত হতে পারবে সুদর্শন।

বাস চলাচলের রাস্তা হলেও এ পথে সাধারণত খুব বেশি লোক হেঁটে চলাফেরা করে না। পথের দু' ধারে অনেক দূর পর্যন্ত কোনও লোকবসতি নেই, আছে কেবল গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং ধানখেত। এ জঙ্গলের মধ্যে অনেক হিংস্র জীবজন্তু আছে, অন্যান্য ছোট-বড় প্রাণী এবং নানারকম পাখিও দেখা যায়।

তবে জীবজন্তুর চেয়েও বেশি ভয় এখানে চোর-বদমাশ ও ডাকাতের। এরকম নির্জনতার সুযোগে তারাই পথচারীদের উপর চড়াও হয়।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। সুদর্শনের সঙ্গে অনেক টাকাপয়সা ছিল, সে ছিল একজন দোকানদার। শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তার মহাজন। তাঁর দেনা মেটাতেই যাচ্ছিল। তার সঙ্গে আর কোনও লোক না থাকায় সে খুব সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে-করতে হাঁটছিল।

বাসেই আসছিল সুদর্শন। বাসে লোকজন ছিল অনেক, গোটা পথটা বাসে যেতে পারলে তার আর কোনও ভয় থাকত না। দুর্ভাগ্যবশত বাসটা শহর থেকে ছ'-সাত কিলোমিটার দূরে খারাপ হয়ে যায়। বাসের ড্রাইভার বলেছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাস মেরামতির কাজ হয়ে যাবে।

অতএব বাসের মধ্যেই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছিল সুদর্শন। অন্য যাত্রীরা দলবেঁধে হাঁটা শুরু করেছিল। তাকেও বলেছিল কেউ-কেউ, 'এদের কথার উপর ভরসা করা যায় না। চলুন, হেঁটেই যাই।' কিন্তু তাদের সঙ্গে যাওয়ার সাহস হয়নি তার।

সেটাই ভুল হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পর তাকে বলেছিল বাসের ড্রাইভার, "না, বাসটাকে চালু করা যাচ্ছে না। আপনি আর অপেক্ষা করবেন না। একটু জোরে হাঁটলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শহরে পৌঁছে যাবেন।"

"এর পরে আর কোনও বাস নেই?"

"মনে হয় না। থাকলে এতক্ষণে এসে যেত।"

"একেবারে একা, কোনও লোকজন নেই, ভয় করছে," সুদর্শন বলল, "এ জায়গাটা আমি চিনি না।"

"তা হলে বাসেই বসে থাকুন। আমরা পাশের গ্রামে যাচ্ছি একজন মিস্ত্রি ডেকে আনতে।"

সুদর্শন আর ভরসা করতে পারেনি তাদের উপর। বগলে ব্যাগটা আঁকড়ে ভয়ে-ভয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে দু'পাশে নজর রেখে পথ চলছিল। এরকম পরিস্থিতিতে সে জীবনে পড়েনি।

চলতে-চলতে পথের ধারে একটি কিশোরকে দেখতে পেল সে। কিশোরটি দাঁড়িয়ে পড়ল সুদর্শনকে দেখে। তাকে দেখে একটু ভরসা পেল সুদর্শন। যাক, তবু তো একজনকে পাওয়া গেল। হোক না দশ-এগারো বছরের ছোট ছেলে, তবু তো মানুষ। নেই মামার চেয়ে কানামামা ভাল।

"শহর এখান থেকে আর কত দূরে খোকা?" জানতে চাইল সুদর্শন।

"দূর আছে, আরও প্রায় আধঘণ্টা হাঁটতে হবে," ছেলেটি উত্তর দিল।

শুনে আঁতকে উঠল সুদর্শন। খুব উদ্বেগের সঙ্গে বলল, "বলো কী? এখনও আধঘণ্টা! এই এতটা পথ আমাকে একা-একা হেঁটে যেতে হবে!"

"একা-একা হাঁটবে কেন?" ছেলেটি বলল, "এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াও, বাস পেয়ে যাবে।"

"দাঁড়াব, এখানে, এই জঙ্গলের ধারে!" বলতে গিয়ে সুদর্শনের গলা একটু কেঁপে গেল, "বাস যদি না আসে তো কী করব আমি? আমি যে বাসে আসছিলাম সেটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

মৃদু হেসে ছেলেটি বলল, "তা হলে আর কী করবে? বাস না এলে তো হাঁটতেই হবে।"

সুদর্শনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

"কাছেই। আচ্ছা, তুমি যাও, রাত হয়ে গিয়েছে," ছেলেটি চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

সুদর্শন ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাত ধরে অনুনয় করে বলল, "তুমি এখনই চলে যেও না ভাই, কিছুটা এগিয়ে দাও আমাকে। এখানে আমি পথঘাট কিছুই চিনি না। আমার একা-একা বড্ড ভয় করছে।"

"ভয় তো করবেই, এ জায়গাটা মোটেও ভাল নয়," ছেলেটি বলল, "সন্ধের পর এ পথে কেউ হেঁটে চলাফেরা করে না। আমাদের গ্রামের লোকেরাও সন্ধের আগেই বাড়ি চলে যায়।"

"আমি তো বাসেই যাতায়াত করি," সুদর্শন বলল, "আজই শুধু..."

"এখন তো সবে সন্ধে হয়েছে, দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে শুরু করো। একটু জোরে হাঁটলে তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছে যাবে," ছেলেটি হেসে বলল, "আমি হলে তো এটুকু পথ ছুটেই চলে যেতাম।"

অসহায়, ভীত কণ্ঠে বলল সুদর্শন, "হাঁটব? যদি চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড়ি? আমার সঙ্গে যদি আর-একজন থাকত, তা হলেও ভরসা পেতাম।"

ছেলেটি একটু ভাবল, তারপর বলল, "আচ্ছা চলো, আমি কিছুদূর যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

"তোমার বাড়ির লোক চিন্তা করবে না তো?"

"না।"

ছেলেটির কথা শুনে ওর কোনও ভয়ডর আছে বলে মনে হল না। না থাকাই স্বাভাবিক, ওর সঙ্গে তো আর টাকাপয়সা নেই। তা ছাড়া ও একটা ছোট ছেলে, ওকে চোর-ডাকাত ধরবে না। ও নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থাকে, এ জায়গাটা ওর খুব পরিচিত। সুদর্শনের ভরসা এই, তেমন দরকার হলে ও ছুটে গিয়ে গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে পারবে।

"চলো," ছেলেটি তাড়া দিল।

তারা হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। অন্ধকার তখন আরও ঘন হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। দু' পাশের বড়-বড় গাছ, ঝোপঝাড় সব যেন ঝাঁকড়া-চুল ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। সামনের পথটাকে আর ভাল করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ছোট ছেলেটি কিন্তু দিব্যি হেসে গল্প করতে-করতে হাঁটতে লাগল। মনে হল অন্ধকারে পথ চলার অভ্যেস আছে ওর।

এক অজানা আশঙ্কায় সুদর্শনের বুক ধুকপুক করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল তার। নির্জনতার সুযোগে যদি হঠাৎ কেউ গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হুঙ্কার দেয়! হাতে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড়ের উপর। তা হলে টাকাপয়সা তো যাবেই, সেই সঙ্গে তার পিতৃদত্ত প্রাণটিও চলে যাবে। ছোট ছেলেটি বিপদ দেখলে পালিয়ে যাবে, যা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। তা ছাড়া ও নিশ্চয়ই তার সঙ্গে শহর পর্যন্ত যাবে না। একটু পরেই ও বাড়ি চলে যাবে।

"একটা আলো যদি সঙ্গে থাকত!" সুদর্শন বলল।

"আলো থাকলে তো ভালই হত," ছেলেটি বলল, "তবে অন্ধকারে আমার অসুবিধে হয় না। আমি তো এ জায়গাটা চিনি।"

ছেলেটি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বলিষ্ঠ হাত ঝপ করে সুদর্শনের কাঁধ চেপে ধরল এবং তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। বিশালদেহী একটা মানুষ তার সামনে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় বলল, "অ্যাই, থাম।"

অন্ধকারে সুদর্শন মুখ দেখতে পেল না সেই মানুষটির। আবার তার হুঙ্কার শোনা গেল, "আর এক পা এগিয়েছিস তো ভোজালি দিয়ে তোর পেট ফুটো করে দেব। তোর কাছে যা আছে সব দিয়ে দে।"

সুদর্শন ঠিক এই ভয়টাই করেছিল। সে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি মারতে লাগল কেউ, গায়ের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। এখন উপায়?

ঠিক সেই সময় অন্ধকারে ভেসে এল সেই ছোট ছেলেটির নির্ভীক কণ্ঠস্বর, "ওকে ছেড়ে দাও। ও আমার লোক, ওকে আমি শহর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কে রে তুই ছেলে? খুব তো সাহস দেখছি তোর। দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে," বলে হুঙ্কার দিয়ে বিশালদেহী মানুষটা টর্চের তীব্র আলো ফেলল ছেলেটির মুখের উপর।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে-সঙ্গে একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, ছেলেটির সারা শরীর দপ করে হ্যালোজেন আলোর মতো জ্বলে উঠেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার সারা শরীর থেকে খুব উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ভাসিয়ে দিল চারদিক। আলোকিত হয়ে উঠল পথ, গাছপালা সব। দেখা গেল বিশালদেহী ডাকাত ও তার সঙ্গীদের।

ক্রমশ উজ্জ্বল হল সেই আলো। ছেলেটি একটি আগুনের গোলার মতো জ্বলতে-জ্বলতে দীপ্তকণ্ঠে বলল, "বিজলি বালকের মুখের উপর কেউ টর্চের আলো ফ্যালে না।"

হতবুদ্ধি হয়ে সুদর্শনকে ছেড়ে দিয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল সেই বিশালদেহী ডাকাত। কয়েক মুহূর্ত পর কিছুটা সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সঙ্গীদের বলল, "তোরা দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দে ওটাকে।"

সঙ্গীরা ভয়-মেশানো কণ্ঠে বলল, "ওরে বাবা, বিজলি বালক! বাঁচতে চাও তো পালাও।"

ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক সুদর্শন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে, ছেলেটির মধ্যে এরকম অসাধারণ ক্ষমতা আছে। তার দিকে তাকাতেও পারছিল না সুদর্শন। চোখ ঝলসে যাচ্ছিল।

ডাকাতটি ভোজালি উঁচু করে ধরে সামনের দিকে এক পা বাড়াতেই ছেলেটি

এক হাত তুলে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল তার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে তার আঙুলের ডগা থেকে জ্বলন্ত সুতোর মতো আলোকরশ্মি ছুটে গিয়ে আঘাত করল ভোজালিটাকে। ইস্পাতের ফলা ঝলসে উঠল, অমনি বিদ্যুতের শক পেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সেই বিশালদেহী ডাকাতটি এবং কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে-করতে স্থির হয়ে গেল। ততক্ষণে তার সঙ্গীরা সকলে হাওয়া, তাদের টিকিও আর দেখা গেল না কোথাও।

সুদর্শন ভয়ে-ভয়ে তাকাল ছেলেটির দিকে। অবাক হয়ে লক্ষ করল, ছেলেটি আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। তার সারা শরীরের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নিষ্প্রভ হচ্ছে ক্রমশ। সুদর্শনের পায়ের কাছে পড়ে ছিল টর্চ, অক্ষত ছিল সেটা। ছেলেটি ঝুঁকে টর্চটি কুড়িয়ে নিয়ে সুদর্শনকে দিয়ে বলল, "এটা তোমার সঙ্গে রাখো। কাজে দেবে। ওই ডাকাতটি এসব এলাকায় দল বেঁধে ডাকাতি করে বেড়ায়। খুব খারাপ লোক।"

"ও কি মরে গিয়েছে?" ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুদর্শন।

"মনে হয় না। তবে ও এখন আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

"ওর সঙ্গীরা সব পালিয়ে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে," সুদর্শন বলল, "ওরা যদি বদলা নিতে ফিরে আসে?"

"হয়তো ফিরবে, আমরা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর," ছেলেটির কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিক শোনাল। চারদিক থেকে অন্ধকার আবার ঘিরে ফেলেছিল তাদের। সুদর্শন টর্চের আলো পথের উপর ফেলল, তবে সাবধানে। তার কানে বাজছিল ছেলেটির কথা, বিজলি বালকের মুখের উপর কেউ টর্চের আলো ফেলে না। বিজলি বালক!

কিছুটা পথ যাওয়ার পর ছেলেটি বলল, "আমি আর যাব না, এখান থেকে আমাদের গ্রামে যাওয়ার একটা পথ আছে। বাড়ি ফিরতে রাত হলে মা চিন্তা করবেন।"

"আর-একটু যাওয়া যায় না?"

"কোনও দরকার নেই। তুমি সোজা হেঁটে যাও, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে পৌঁছে যাবে," ছেলেটি বলল, "ভয় নেই, আর কেউ তোমাকে আটকাবে না।"

সুদর্শন ওই ঘটনার পর থেকে ছেলেটির সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছিল। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

"আমার নাম কিট্টু। তোমার নাম কী?"

"সুদর্শন," তারপর বলল, "তুমি তো কোনও সাধারণ ছেলে নও। তোমার সারা শরীর যেভাবে দপ করে জ্বলে উঠল, একটা আগুনের গোলা হয়ে গেল!"

"ওটা আমার হয়," কিট্টু আনন্দের সঙ্গে বলল, "কীভাবে হয় তা আমিও জানি না।"

"ডাকাতগুলো তোমাকে বিজলি বালক বলে?"

"হ্যাঁ, এ অঞ্চলে আমাকে বিজলি বালক বলে সকলে। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।"

"তোমাকে ভয়ও করে সকলে নিশ্চয়ই?"

"কী জানি। আচ্ছা আমি চলি।"

"সাবধানে যেও," সুদর্শন লক্ষ করল কিট্টুর চোখ দু'টো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে হল, যেন একটা আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ থেকে, যা অন্ধকারে মোড়া সবকিছুকে দেখার পক্ষে যথেষ্ট। টর্চ জ্বেলে সুদর্শনের দেখবার সাহস হল না, কিট্টু কোন দিকে যাচ্ছে। সে আবার হাঁটতে শুরু করল। কিট্টুর সঙ্গে ডাকাতদের মোকাবিলার অদ্ভুত ঘটনাটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল তার। ওইটুকু ছোট ছেলের কী আশ্চর্য ক্ষমতা! ও কি মানুষ, না অন্য কিছু?

॥ ২ ॥

কিট্টুর এই অসাধারণ ক্ষমতা সহজাত ছিল না। তার যখন দু' বছর বয়স, তখন এক রাতে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাজ পড়ছিল সে রাতে। কিট্টু আপন মনে খেলতে-খেলতে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। ঠিক সেই সময় ঝলসে উঠেছিল বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড আওয়াজ করে আছড়ে পড়েছিল বাড়ির উঠোনে।

বজ্রপাতের ভয়ংকর আওয়াজ শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কিট্টুর মা। কিট্টুকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন কিট্টুর নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে।

বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি, চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল তাঁর। কিট্টুর মা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। আগুনের একটি লাল গোলা কিট্টুর চারপাশে বাঁইবাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে। কিট্টু ভয়ের চোখে দেখছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কয়েক সেকেন্ড পর আগুনের সেই লাল গোলা কিট্টুর বুকে গিয়ে আঘাত করল। কিট্টুর সারা শরীর দপ করে জ্বলে উঠল, তার পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। আগুনের গোলাটি আর দেখা গেল না।

বজ্রাঘাতে ছেলে মারা গিয়েছে। এই আশঙ্কায় বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন কিট্টুর মা। আর্তনাদ শুনে ঘর থেকে সকলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। কিট্টু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়ের চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেয়ে কেঁদে উঠেছিল সে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। তার শরীরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি সে সময়, প্রচণ্ড তাপে চামড়া কোথাও ঝলসে যায়নি।

তারপর থেকেই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখল বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা। কিট্টু যদি কোনও কারণে রেগে যায় বা বিরক্ত হয়, তা হলে খুব তেতে যায় তার শরীর, দপ করে সারা শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে, তার কাছে যাওয়া যায় না তখন। রাতের অন্ধকারেও চারপাশ আলোকিত হয়ে যায়, চোখ ঝলসে যায় তার দিকে তাকালে। রাগ পড়ে গেলে বা মেজাজ ঠান্ডা হলে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে কিট্টু। তার আচরণে মনেই হয় না অস্বাভাবিক কোনও পরিবর্তন হয়েছিল তার মধ্যে।

প্রথম-প্রথম কিট্টুর বাড়ির লোকেরা খুবই ভয় পেয়ে যেত কিট্টুর সারা শরীর জ্বলতে দেখে। সে সময় সে কোনও দাহ্য পদার্থে হাত দিলেই সেটায় আগুন ধরে যেত বা তা থেকে ফুলকি বেরোত। কেউ বুঝতে পারত না কেন এমন হচ্ছে, কিট্টুরও বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা হয়নি তখন। স্বাভাবিক অবস্থায় সে অন্য ছোটদের মতোই হেসেখেলে ছুটে বেড়াত। তবু মা ছাড়া আর কেউ তার কাছে যেতে সাহস পেতেন না। সকলে ভয়ে-ভয়ে এড়িয়ে চলতেন কিট্টুর স্পর্শ।

সকলেই ধরে নিয়েছিল যে, এটা একটা অদ্ভুত ধরনের অসুখ। ডাক্তার, বদ্যি, ওঝা অনেক দেখানো হয়েছিল, ঝাড়ফুঁক করা

হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। কিট্টুকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিলেন ডাক্তার-বদ্যিরা, কিন্তু তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই তাঁরা খুঁজে পাননি। তাঁরা কেউ জ্বলতে দেখেননি কিট্টুকে, তাই বিশ্বাস করেননি কিট্টুর মা-বাবার কথা। হেসে বলেছেন, "এরকম হতেই পারে না, অসম্ভব! আপনারা বরং নিজেদের মাথার চিকিৎসা করান। কিট্টুর কিছুই হয়নি।"

ডাক্তার-বদ্যিরা হেসে উড়িয়ে দিলেও কিট্টুর বাবা-মা তা পারেননি। হেসে উড়িয়ে দিতে পারেননি তাঁরাও, যাঁরা কিট্টুর দপ করে জ্বলে ওঠার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রেগে যাওয়ার পর কিট্টুর শরীর থেকে যখন আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, শুকনো ডাল-পাতায় আগুন ধরে যেত। আশপাশে যারা তখন থাকত, তাদের সকলেরই মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত।

এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, কিট্টু কিছু মানুষকে সহ্য করতে পারত না। তাদের কেউ ওর সামনে এলেই রাগ চড়ে যেত কিট্টুর। ছোট্ট বয়স থেকেই সে বুঝতে পারত কোন কাজটি অন্যায় হচ্ছে। অন্য ছোটদের মতো নিজের কোনও দাবি নিয়ে জেদাজেদি সে কখনও করত না। মায়ের ধমকানি, বাবার শাসনে চোখ ফেটে জল আসত। কিন্তু আগুন বেরোত না তার শরীর থেকে।

গ্রামের লোক কিট্টুর নাম রেখেছিল 'বিজলি বালক'। সেই নামই ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকায়। তার সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচার হওয়ায় ওখানকার মানুষের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিট্টুকে দেখলেই সাবধান হয়ে যেত সকলে।

একটা দেখার মতো ব্যাপার ছিল যে, জ্বলন্ত অবস্থায় কিট্টুর কথাগুলো হত বেশ স্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ। অনেক সময় তার কণ্ঠে থাকত ধমকের সুর। মনে হত তার মুখ দিয়ে অন্য কেউ কথাগুলো বলছে।

একটু বড় হওয়ার পর কিট্টু মাঝে-মাঝে বলত তার মাকে, "জানো মা, আমার মধ্যে হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় এক-এক সময়। তখন আমি আর নিজের মধ্যে থাকি না, অন্য এক মানুষ যেন ভর করে আমার উপর। যা করার সব সে-ই করে, আমি শুধু দেখি। আমি দেখেছি, আমার সামনে অন্যায় কিছু ঘটলে, খারাপ মতলব নিয়ে কেউ আমার কাছে এলে অথবা কোনও কিছু আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলে ওরকম অবস্থা হয়, শরীর থেকে আগুন ছুটতে আরম্ভ করে। আমার কিন্তু একটুও গরম লাগে না।"

যে মানুষটি ভর করে সে কি কোনও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূত? কিট্টুর বাবার সেরকমই সন্দেহ হয়েছিল। একদিন তিনি এক ওঝা ডেকে এনেছিলেন কিট্টুর ঘাড় থেকে ভূত তাড়াতে।

ওঝার চেহারা, হাবভাব ও কথাবার্তা মোটেই ভাল লাগেনি কিট্টুর। সে বলেছিল তার মাকে, "আমার ঘাড়ে কোনও ভূতটুত ভর করেনি। ওই ওঝাকে তাড়িয়ে দাও, ও ভাল লোক নয়।"

ওঝা সে কথা শুনে দেঁতো হাসি হেসে বলেছিল, "বুঝেছি, ভূতটি খুব সেয়ানা। কোনও ভয় নেই, ও যদি বুনো ওল হয় তো আমি বাঘা তেঁতুল। দেশের সব ক'টা ভূত আমাকে যমের মতো ভয় করে। দ্যাখো না, কীভাবে তাড়াই ওকে। বাছাধনকে পালাতে হবে।"

ওঝার ভূত তাড়াবার প্রক্রিয়া শুরু হতেই জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল কিট্টু। ওঝা তার রুদ্রমূর্তি দেখে এক মুঠো সরষে মন্ত্র পড়ে ছুড়ে মেরেছিল কিট্টুর গায়ে। সরষেগুলো জ্বলতে-জ্বলতে নীচে পড়লে কিট্টু তার কয়েকটি কুড়িয়ে নিয়ে ওঝার গায়ে ছুড়ে মেরেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সারা দেহে ফোস্কা পড়ে জ্বলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল ওঝার। কিট্টু বলেছিল, "ভাল চাস তো চুপচাপ চলে যা এখান থেকে।"

তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে পালাতে-পালাতে বলেছিল ওঝা, "ওরে বাবা, এ তো ভূত নয়, জিন! আমি জিন তাড়াতে পারি না।"

জিন তাড়াতে আনাও হয়েছিল একজনকে। দূর থেকে তাঁকে দেখেই জ্বলে উঠেছিল কিট্টু। তিনি বাড়িতেও ঢোকেননি। কিট্টুর রুদ্রমূর্তি দেখে রাস্তা থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন।

আঙুল তুলে বিদ্যুৎ-বাণ ছোড়া শুরু হয়েছিল আরও অনেক পরে। একবার গ্রামের কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির ছেলে নিজেদের প্রতাপ দেখাতে অকারণে এক দোকানদারকে মারধোর করছিল। কিট্টু তা দেখে রেগে গিয়ে বলেছিল, "এ কী হচ্ছে, ওকে মারছ কেন? ছেড়ে দাও।"

"তুই যেখানে যাচ্ছিস যা," একটি ছেলে বলেছিল, "আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব, তোকে নাক গলাতে হবে না।"

"তোমরা অন্যায় করছ," কিট্টু জ্বলতে শুরু করেছিল।

একটি ছেলে বলেছিল তার সঙ্গীদের, "ছেড়ে দে, কিট্টু গরম হচ্ছে।"

"হোক।" আর-একটি ছেলে বলেছিল, "ও কী করবে আমাদের?"

কিট্টু তখন আগুনের গোলা। তার একটি হাত যেন আপনা থেকেই উঠে গিয়েছিল, আঙুল নির্দেশ করেছিল সেই ছেলেটিকে, এবং সেই আঙুল থেকে মুহূর্তের মধ্যে আলোকরশ্মি ছুটে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল তাকে। অন্য চারটি ছেলে পালাবার সুযোগও পায়নি, তাদেরও একই অবস্থা হয়েছিল। আশপাশে যারা ছিল তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল এ দৃশ্য দেখে।

এভাবে কয়েকটি ছিঁচকে চোর, কিছু স্থানীয় সমাজবিরোধী এবং গোটা একটি ডাকাতদলকে কাবু করবার পর বিজলি বালক কিট্টু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই এলাকার দুষ্কৃতীদের কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। পারতপক্ষে কিট্টুকে এড়িয়ে চলত তারা, তার ধারে কাছে ঘেঁষত না। তাকে দেখলেই তাদের বুক ধুকপুক করত ভয়ে। নতুন মানুষরা অবাক হয়ে বলত, "ও মা, ওইটুকু ছোট ছেলেকে ভয় পাস তোরা?"

ওকে ওরকম দেখতে হলে কী হবে, ও একটি আগুনের গোলা। বিজলি বালক! কেউ কোনও অন্যায় কাজ করলে ও ঠিক বুঝতে পারে। কিট্টুকে দেখতে পেলেই তারা বলাবলি করত, "ওই দ্যাখ, কিট্টু যাচ্ছে, খুব সাবধান! এমন কিছু করবি না যাতে ও রেগে যায়!"

"চল, ভালয়-ভালয় পালাই এখান থেকে। তাকাস না ওর দিকে, তাকাস না। চল, আমরা অন্য দিক দিয়ে কেটে পড়ি।"

যারা সমাজবিরোধী, নানারকম কুকর্ম করে বেড়ায়, তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত তফাত আছে। তাদের কেউ খারাপ পথে গিয়েছে স্বভাবের দোষে, একেবারে হাড়বজ্জাত, আবার কেউ-কেউ ততটা খারাপ নয়, অভাবে পড়ে অথবা পরিস্থিতির জন্য খারাপ কাজ করছে। একটু চেষ্টা করলে এদের অনেককেই শোধরানো যায়।

ওই এলাকার দুষ্ট স্বভাবের

মানুষগুলোর মধ্যে অনেকেই বিজলি বালকের রাগ এড়াতে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছিল। যারা তা করতে পারেনি তারা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিল ওই এলাকা ছেড়ে। তবে সেখানে এমন লোকও ছিল, যারা এলাকার মধ্যে কোনওরকম খারাপ কাজ করত না, অন্য কোনও এলাকায়, সাধারণত শহরে গিয়ে উলটোপালটা কাজ করত। তারা বিজলি বালক কিট্টুকে তাদের পথ থেকে হটাবার ফন্দি আঁটত।

কিট্টু ছিল নিতান্তই ছেলেমানুষ। তাকে যে কিছু মানুষ ভয় করে এড়িয়ে চলে, পছন্দ করে না, এ সম্পর্কে তার ধারণাই ছিল না। কে ভাল আর কে খারাপ মানুষ, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো বয়স তার হয়নি। সে শুধু একটা ব্যাপার জানত, তার ভিতরে এমন কিছু শক্তি আছে, যার লড়াই সব সময় খারাপ মানুষ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যা কিছু করবার সেই শক্তিই করে তাকে দিয়ে।

তবে কিট্টু এটুকু বুঝেছিল, যে মানুষগুলো ইচ্ছে করে জেনেশুনে অন্যের উপর অত্যাচার করে, অন্যের ক্ষতি করে, তারা খারাপ, তাদের ভালমতো শিক্ষা দেওয়া দরকার।

আর-একটা বিস্ময়কর ব্যাপার গ্রামের অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিট্টু যে এলাকায় বাস করত তার অনেকটা জুড়ে ছিল জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে নানারকম হিংস্র জীবজন্তু চলাফেরা করত। তা ছাড়া সাপখোপও ছিল অনেক। কিন্তু আশ্চর্য, তারা কেউ কিট্টুকে কখনও আক্রমণ করত না। কিট্টু তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও তারা তাকে দেখলেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত।

একদিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। সন্ধেবেলা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল একটা বাঘ। বাঘটি দাঁড়িয়ে ছিল গ্রামের মোড়লের গোয়াল ঘরের পিছনে একটা ঝোপের মধ্যে। বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়ে সন্ত্রস্ত গোরুগুলো তারস্বরে ডাকছিল। গোরুগুলোর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মোড়লের বড় ছেলে। কী হয়েছে তা দেখবার জন্য সে গোয়ালের দিকে কয়েক পা এগোতেই আচমকা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঘটি।

বাঘটিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল মোড়লের ছেলে, "বাঁচাও! বাঘ!"

কিট্টু তার বাবার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে তাঁরা ঠিক সেই সময় মোড়লের বাড়ির পিছনের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কিট্টুর বাবার হাতে একটি টর্চ ছিল। গোরুগুলোর ডাক এবং মোড়লের ছেলের আর্ত চিৎকার কানে আসতেই কিট্টু তার বাবাকে বলেছিল, "মনে হয়, এ বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে। টর্চের আলোটা শিগগির ওই দিকে ফ্যালো।"

কিট্টুকে দেখতে পেয়েই সাংঘাতিক ঘাবড়ে গিয়েছিল যেন বাঘটি। সে মোড়লের ছেলেকে সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর ভয়ে কিট্টুর দিকে তাকিয়ে কয়েক পা পিছু হটে লেজ গুটিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। মোড়লের বড়ছেলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটা চেলাকাঠ হাতে তুলে নিয়েছিল। ফলে গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচার হয়েছিল যে, সেই ছেলেই প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে বাঘটিকে চেলাকাঠ দিয়ে মেরে তাড়িয়েছে। কিট্টুর বাবাই কেবল বুঝেছিলেন যে, কিট্টুর ভিতরে যে শক্তি আছে, সে-ই বাঘটিকে পালাতে বাধ্য করেছে। জীবজন্তুরা এসব ঠিক বুঝতে পারে।

হিংস্র জন্তুদের নিয়ে এরকম আরও ঘটনা ঘটেছিল। কিট্টুর উপস্থিতি কীভাবে তাদের বাধ্য করে পালিয়ে যেতে, এটা গ্রামের অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিল। বিষধর সাপ ফণা উঁচু করে ফোঁস করবার পর সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছে কিট্টুকে দেখে, এটা অনেকের নজরে পড়েছিল। গ্রামের মানুষ বুঝেছিল যে, সেদিন বাঘটির পালানোর কারণ ছিল কিট্টু। মোড়লের ছেলের হাতের চেলাকাঠ নয়। আশ্চর্য ছেলে, ওর কি একটুও ভয়ডর নেই? তারা বলাবলি করত বিস্মিত হয়ে।

॥ ৩ ॥

সুদর্শন শেষে পৌঁছে গেল শহরে। পথে আর কোনও অঘটন ঘটল না। স্বস্তি পেল সে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল তার। বাব্বা! কী বিপদেই না পড়েছিল! বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছে বিজলি বালক কিট্টু তার সঙ্গে থাকায়। সে না থাকলে সেই ডাকাতটি সুদর্শনের পেটে ভোজালি

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি।
১৫ টাকা

মহাশ্বেতা দেবীর আশ্চর্য বই
তুতুল ২৫ টাকা

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
১৫ টাকা
লেখকের আরেকটি বই চড়ুইয়ের সঙ্গে ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি
৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ। ৪০ টাকা
'গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'—মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল।

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
৪৫ টাকা

শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত হচ্ছে। ১৫ টাকা

ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান।
২০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের নতুন বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। ৫০ টাকা

লেখকের ছোটদের আরও বই
পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা আমার বনবাস ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট) ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন
কমপক্ষে ২০০ টাকার বইয়ের অর্ডার দিলে আমাদের খরচে আপনার ঠিকানায় বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টাকা পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 Ph: 2283-2320

ঢুকিয়ে তাকে হয়তো মেরেই ফেলত।

ক্লান্ত সুদর্শন সোজা চলে গেল তার মহাজন সরোজ শেঠের কাছে, দেনা মেটাতে। সরোজ শেঠ ছিলেন সেই শহরের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী। একজন সৎ ব্যবসায়ী বলে তাঁর সুনাম ছিল। অন্যায়ভাবে দু' নম্বরি কারবার করে মানুষকে ঠকিয়ে দু' পয়সা বেশি লাভ করবার মানসিকতা তাঁর কখনও ছিল না।

গ্রামাঞ্চলের অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে নিয়মিত লেনদেন হত সরোজ শেঠের। সুদর্শনের মতো ছোট দোকানদারদের বন্ধু ছিলেন তিনি, অনেক গরিব মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল তাঁর কাছে।

সুদর্শনের কাছে সরোজ শেঠ শুনলেন তার আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। কীভাবে একটি ছোট ছেলে সাংঘাতিক বিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছে, তা বলল সুদর্শন। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী কিট্টু। সে দরকার হলে দপ করে জ্বলে উঠে আগুনের গোলা হয়ে যেতে পারে। তার আঙুলের ডগা দিয়ে বিদ্যুৎ তিরের মতো ছোটে। এসব কথা শুনে ভীষণ অবাক হলেন সরোজ শেঠ।

"সত্যি বলছ? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না," তিনি বললেন।

"আমি যা বললাম তার এক কণাও মিথ্যে নয় সরোজদা," সুদর্শন বলল।

"আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে," সরোজ শেঠ বললেন, "চলো, ছেলেটিকে খুঁজে বের করি। এরকম অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে একটি ছেলে গ্রামে পড়ে থাকবে, তা হয় না। গুন্ডা-বদমাশ চোরাকারবারিতে ছেয়ে গিয়েছে শহর। তাদের শায়েস্তা করতে হলে এরকম কাউকে আমার দরকার। কী নাম বললে ছেলেটির?"

"কিট্টু। বিজলি বালক।"

"তুমি কি ওর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে নিয়েছ? জানো ও কোথায় থাকে?"

"না," সুদর্শন বলল, "তবে যে জায়গাটায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, জায়গাটা চিনতে পারব। কিট্টু বলেছিল, তারই কাছাকাছি ওর বাড়ি।"

"গ্রামের নামটা তোমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল," সরোজ শেঠ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ওকে খুঁজে বের করা যাবে।"

"কিট্টু আমাকে বলেছে এই অঞ্চলে ওকে বিজলি বালক বলে জানে সকলে," সুদর্শন বলল, "ওখানে কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে ওর বাড়ি দেখিয়ে দেবে।"

"তাই নাকি? তবে আর দেরি কেন? কালই চলো," সরোজ শেঠ উৎসাহিত হয়ে বললেন।

সরোজ শেঠ দীর্ঘদিন ধরেই গুন্ডা-বদমাশদের মোকাবিলা করবার একটা উপায় খুঁজছিলেন। তাই তিনি আর দেরি করলেন না। পরদিনই কয়েকজন সঙ্গী ও সুদর্শনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিজলি বালকের সঙ্গে দেখা করতে।

"এ ব্যাপারটা খুব গোপন রাখা দরকার," তিনি বললেন, "বদমাশদের কানে গেলে তারা ছেলেটির ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে।"

সরোজ শেঠ নিজেও খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। গুন্ডা-বদমাশরা মাঝে-মাঝেই তাঁকে হুমকি দিত, তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করত, না দিলে তাঁকে মেরে ফেলার ভয়ও দেখাত। পুলিশের বড়কর্তাদের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তবে ভরসা ছিল না তাঁর।

যে জায়গায় কিট্টুর সঙ্গে সুদর্শনের দেখা হয়েছিল, সেখানে গেলেন তাঁরা। তখন প্রায় দুপুরবেলা, রাস্তায় কোনও লোকজন ছিল না। রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় বসে ছিল কয়েকজন। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে একটু চমকে উঠে বলল, "আপনারা বিজলি বালকের বাড়ি যাবেন? কেন?"

"আমাদের একটু দরকার আছে," সরোজ শেঠ বললেন।

"কিট্টু আমাকে চেনে," সুদর্শন বলল।

লোকটি একজনের সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করল। তারপর প্রশ্ন করল, "আপনাদের পরিচয়?"

সরোজ শেঠ নিজের এবং সঙ্গীদের পরিচয় দিলেন। হেসে বললেন, "আমরা খারাপ লোক নই।"

লোকটির সঙ্গে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলেও ছিল। লোকটি ছেলেটিকে ডেকে বলল, "রতন, এঁদের কিট্টুর বাড়ি নিয়ে যা।"

যেতে-যেতে রতন বলল, "কিট্টু আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে খেলা করি। ও খুব ভাল ছেলে। তোমাদের মতো অনেকেই দেখা করতে আসে ওর সঙ্গে। দু' দিন আগেও কয়েকজন এসেছিল।"

"যারা আসে তারা কি সকলে ভাল লোক?" সরোজ শেঠ প্রশ্ন করলেন।

ঠোঁট উলটে বলল রতন, "কী জানি, আমি অত বুঝি না। তবে কিট্টু বুঝতে পারে, ও সকলের সঙ্গে দেখা করে না। কিট্টু রেগে গেলে ওর গা থেকে আগুন বেরোয়, খারাপ লোকেরা ওর কাছে যেতেই ভয় পায়," রতন একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলল, "তবে আমরা ভয় পাই না, আমরা একসঙ্গে খেলাধুলো করি। ওই যে ওদের বাড়ি। দাঁড়াও, আমি কিট্টুকে ডেকে আনছি।"

সরোজ শেঠদের দাঁড়াতে বলে রতন ছুটে গিয়ে কিট্টুদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। কিট্টু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল। বিজলি বালকের সারা শরীর যেন দপ করে গ্যাসের আলোর মতো জ্বলে উঠল, বিদ্যুৎ বেরোতে লাগল চারদিকে। সকলেই স্তম্ভিত, হতবাক। পর মুহূর্তে কিট্টু একটা আঙুল তুলে নির্দেশ করতেই সরোজ শেঠের বাঁ পাশে দাঁড়ানো লোকটি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল এবং ছটফট করতে-করতে স্থির হয়ে গেল।

যেমন করে হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল তেমনভাবেই নিভে গেল আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিট্টু আবার স্বাভাবিক। সে এমন ভাব দেখাল যে, তার কিছুই হয়নি।

অন্যেরা খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়, বুক ধুকপুক করছিল সকলের। কিট্টু সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল, "এসো তোমরা। শহরে পৌঁছতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি কাল?"

"না," ভয়ে-ভয়ে বলল সুদর্শন।

"সে জন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম," সরোজ শেঠ বললেন।

কিট্টুর মা একটা মাদুর হাতে নিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, "আমাদের মাটির ঘর, জায়গা কম। বারান্দায় মাদুর পেতে দিচ্ছি, বোসো।"

সরোজ শেঠ মাটিতে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, "এর এই দশা হল কেন?"

"কী জানি, হঠাৎ হয়ে গেল," কিট্টু বলল, "আমার মনে হয় ওই লোকটি ভাল নয়, ওর মধ্যে কিছু খারাপ মতলব ছিল।

লোকটি কি তোমাদের সঙ্গে এসেছে?"

"হ্যাঁ, ও আমার দোকানে কাজ করে। ওকে তো ভাল লোক বলেই জানি।"

"আমার ভিতরের লোকটি কখনও ভুল করে না," কিট্টু বলল, "সে সব বুঝতে পারে। ও লোকটি নিশ্চয়ই আমার কোনও ক্ষতি করতে এসেছিল।"

"লোকটি কি মরে গিয়েছে?"

"না মরেনি। একটু পরেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে, তখন ওকে জিজ্ঞেস করলে সব জানতে পারবে। তোমরা এখানে বোসো।"

বারান্দায় পাতা মাদুরের উপর বসলেন সকলে। সরোজ শেঠের সঙ্গে কিট্টুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুদর্শন বলল, "ইনি খুব ভাল মানুষ। শহরে বিরাট প্রতিপত্তি, আমাদের মতো গরিব দোকানদারদের অনেক উপকার করেন।"

সরোজ শেঠ গম্ভীরভাবে বললেন, "কাল রাতে তোমার অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানার পর আমার মনে হয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। শহরে অনেক গুন্ডা-বদমাশ আর বাজে লোকদের আড্ডা। যে-কোনও অন্যায় কাজ তারা করতে পারে। শহরের ভাল মানুষরা সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়ে থাকে।"

"আমরা বুঝতে পারি না কে ভাল মানুষ আর কে মন্দ মানুষ," সুদর্শন বলল।

"এটা বোঝা কঠিন," সরোজ শেঠ বললেন, "তবে কিট্টুর মতো অসাধারণ ক্ষমতা যাদের আছে, তারা সহজেই বুঝতে পারে।"

"আমার মধ্যে কোনও ক্ষমতাটমতা নেই," কিট্টু হেসে বলল, "তবে আমি জানি, আমার মধ্যের লোকটি সব পারে।"

"সে জন্যই তো আমার খুব চিন্তা হচ্ছে," সরোজ শেঠ বললেন, "তোমার বয়স বড় কম, একেবারে ছেলেমানুষ তুমি। এসব অঞ্চলের বদমাশরাও নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে। ওরা চাইবে যে-কোনওভাবে তোমাকে ওদের পথ থেকে সরাতে। তোমাকে মেরেও ফেলতে পারে সুযোগ পেলে। এসব কথা ভেবেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।"

কিট্টুর মা শঙ্কিত হয়ে বললেন, "না না, আমার ছেলের কোনও ক্ষতি করতে দেব না. আমি ওকে এই বাড়ির মধ্যে আটকে রাখব।"

"তাতে লাভ কী? বদমাশরা রাতদুপুরে এসে বাড়িটাই জ্বালিয়ে দেবে অথবা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে," সরোজ শেঠ বললেন।

কিট্টু ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। আমার ভিতর যে লোকটি আছে, তাকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। যারা চেষ্টা করেছে তারা বুঝেছে।"

"বেশ তো!" সরোজ শেঠ বললেন, "কিন্তু শুধু কি নিজেকে বাঁচালেই চলবে? গুন্ডা-বদমাশ আর খারাপ লোকগুলোর বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভাল মানুষদের বাঁচাতে হবে না?"

"কথাটা ঠিক বলেছ," তবে, কিট্টুকে বেশ অসহায় দেখাল, "আমি তো ছেলেমানুষ, আমি কি একা লড়তে পারি কখনও?"

"না কিট্টু, তুমি একা লড়বে কেন?" সরোজ শেঠ বললেন, "আমরা তোমার মতো বুদ্ধিমান, সৎ ও সাহসী ছেলেদের নিয়ে একটা বড় দল গড়ে তুলব। আমরা বুড়োরাও থাকব সেই দলে, সকলে মিলে লড়ব।"

কিট্টু খুব উৎসাহিত হয়ে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, "তা হলে তো ভালই হয়। আমি এমন কয়েকজনকে জানি, যারা খুব সৎ এবং সাহসী, ভাল ফুটবলও খেলে। তারা আমাদের গ্রামেই থাকে, আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে খেলাধুলো করি। ডেকে আনব তাদের? এক ছুটে যাব আর আসব। আমি বললেই তারা..."

"না না, এখন তোমাকে কোথাও যেতে হবে না কিট্টু," সরোজ শেঠ হেসে বললেন, "তোমার বন্ধুরাও দলে থাকবে নিশ্চয়ই। তবে গুন্ডা-বদমাশদের তো ফুটবল খেলে দমানো যায় না," মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির উপর নজর পড়ল তাঁর। লোকটিকে হাত-পা নাড়তে দেখে তিনি বললেন, "মনে হয় ওই লোকটি একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। দেখা যাক, ওর কী খারাপ মতলব ছিল, যা তোমার ভিতরের লোকটি বুঝতে পেরেছে!"

সেই লোকটি ছিল সরোজ শেঠের দোকানের একজন পুরনো কর্মচারী। তাকে দেখেই বোঝা গেল যে, সে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছে, আতঙ্কে তার চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সরোজ শেঠ তাকে একটু চাপ দিতেই লোকটি স্বীকার করল যে, একটি চোরাই জিনিস পাচারকারী দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। সে জানাল যে, বিজলি বালক কিট্টুর জন্য সেই দলের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। কিট্টুর সঙ্গে সরোজ শেঠ দেখা করতে যাচ্ছেন শুনে দল থেকে তাকে বলা হয়েছে, কিট্টুকে দেখতে পেলেই তাকে খতম করবার জন্য।

লোকটির পকেট থেকে বেরোল একটি গুলিভর্তি পিস্তল।

"দেখলে তো, আমার ভিতরের লোকটি কখনও ভুল করে না," কিট্টু বলল।

প্রচণ্ড খেপে গেলেন সরোজ শেঠ। কী সাংঘাতিক ব্যাপার, এরকম একটা কালসাপ পুষেছেন তিনি এতদিন ধরে। তাঁরই নাকের ডগায় ভালমানুষ সেজে বসে লোকটি তাঁর কারবারের সর্বনাশ করে যাচ্ছে, লিপ্ত হয়েছে একটি জঘন্য ষড়যন্ত্রে!

সরোজ শেঠ চোখ রাঙিয়ে বললেন লোকটিকে, "এই মুহূর্তে আমি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম। বেআইনি মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার জন্য তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব আমি, তোমার কঠিন শাস্তি হবে।"

হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে লোকটি সরোজ শেঠের পা জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনি আমাকে যত খুশি শাস্তি দিন, কিন্তু দয়া করে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না। চোরাচালানকারীরা তা হলে ঠিক খবর পেয়ে যাবে। আমাকে ওরা প্রাণে মেরে ফেলবে। ওরা সাংঘাতিক, ওদের কোনও মায়াদয়া নেই। ওরা সব পারে, ওদের লোক সব জায়গায় আছে।"

কিট্টু বলল, "তুমি ভালমানুষ তাই বুঝতে পারনি, কিন্তু আমার ভিতরের লোকটি সব বোঝে।"

সরোজ শেঠ পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলেই কি তোমাদের দলের হাত থেকে তুমি বাঁচবে ভেবেছ? ওরা তোমাকে রেহাই দেবে না, আজ না হোক কাল তুমি ধরা পড়বেই।"

হাতজোড় করে ভয়ে লোকটি বলল, "আমাকে মাপ করুন। আমি শহর থেকে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাব, ওরা আমাকে খুঁজেই পাবে না। দয়া করে আমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দিন।"

"তুমি কিট্টুকে মারতে এসেছিলে, ও

তোমাকে ধরেছে," সরোজ শেঠ বললেন, "যা করবার কিটুই করবে, আমি কিছু বলব না। তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে এই জঘন্য অপরাধের জন্য।"

কিটু বলল, "আমার ভিতরের লোকটির মায়া-দয়া আছে। ছেড়ে দাও ওই লোকটির উপর, ও চলে যাক।"

সরোজ শেঠ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বলো কী, ওকে ছেড়ে দেব?"

"হ্যাঁ। বড্ড কান্নাকাটি করছে।"

সরোজ শেঠ ভেবেছিলেন আর-একটা চমকপ্রদ দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ঘটবে। কিটু জ্বলে উঠবে আবার এবং কিছু একটা শাস্তি দেবে লোকটিকে। তা না হওয়ায় তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে গুম মেরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর লোকটির হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "যাও এখান থেকে। আমি আর তোমার মতো বেইমানের মুখ দেখতে চাই না।"

লোকটি আর কালবিলম্ব না করে সন্তর্পণে পিছু হটতে-হটতে কিছুদূর গেল, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

কিটুর মা-বাবা গ্রামের সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁরা সরোজ শেঠ ও তাঁর সঙ্গীদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন, দুপুরবেলা তাঁদের ভাত না খাইয়ে ছাড়লেন না। অনেক কথা হল। কিটুর জন্য তাঁরা যে উদ্বিগ্ন, তা জানালেন।

"কিটু বড্ড চঞ্চল, কখন যে কী করে বসে তা বুঝতে পারি না," কিটুর বাবা বললেন, "এই দেখে এলাম মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছে, তার পরই খবর পেলাম, ও সদর রাস্তার দিকে চলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি ছেলেটা আগুনের গোলার মতো জ্বলছে।"

"তারপর?"

"দেখলাম, রাস্তার পাশে একটা লরি কাত হয়ে আছে, চার-পাঁচটা লোক পড়ে আছে মাটিতে। ওখানে যারা জড়ো হয়েছিল তারা বলল, ওই লরিতে অনেক জিনিস চালান হচ্ছিল, কিটু লরিটিকে আটকেছে টায়ার ফাটিয়ে দিয়ে, আর লরির লোকগুলোকে শুইয়ে দিয়েছে।"

"কিটু খবর পেল কী করে?"

"ভগবান জানেন। ওর ভিতরের লোকটা নাকি সব জানে," কিটুর বাবা বললেন, "লোকগুলোর কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল, কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করার সুযোগই পেল না তারা। শুনলাম, পুলিশকে নাকি খবর দেওয়া হয়েছে, তারা আসছে। আমাকে দেখে কিটুর আগুন নিভে গেল, তখন তার মধ্যে আর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। আমার কাছে এসে বলল, 'চলো বাড়ি যাই,' দিব্যি ভাল মানুষ। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বললাম, এসব করিস কেন? বিপদ হতে পারত।"

কিটু বলল, "আমি কিচ্ছু করিনি।"

"তুই না তো কে করেছে?"

"আমার ভিতরের লোকটি।"

কিটুর বাবা বললেন, "এরকম একটা না একটা ঘটনা আগে প্রায় রোজই ঘটত। এখন অনেক কমে গিয়েছে। রাতদুপুরে উঠে গিয়ে চোর-ডাকাত ধরেছে। একবার এক ডাকাতের পকেটে রাখা বোমা ফেটে তো লোকটি মরেই গেল। লোকটি নাকি ছুড়বে বলে বোমাটি পকেট থেকে বের করতে যাচ্ছিল।"

"কিটুর সাহস আছে বলতে হবে।"

"একটুও ভয়ডর নেই। একবার এই গ্রামেরই একটা ছেলেকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল কিছু লোক। কিটু সেই গাড়ি থামিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করল। লোকগুলোকে মাটিতে শুইয়ে গাড়িটি জ্বালিয়ে দিল।"

কিটু হাসিমুখে প্রতিবাদ করল, "আমি কি ওসব করেছি? যা করার ভিতরের লোকটি করেছে। ও সব পারে।"

সরোজ শেঠ বললেন, "তোমার ভিতরের লোকটি লড়ছে অন্যায় ও খারাপ মানুষদের বিরুদ্ধে, তাই না? আমরা যে দল গড়ব, তার লড়াই হবে দেশের গুন্ডা-বদমাশ ও মস্তানদের সঙ্গে।"

কিটু একটু হতাশ হয়ে বলল, "তোমরা ফুটবল খেলবে না?"

সরোজ শেঠ হেসে বললেন, "খেলব, তবে তার আগে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শান্তির পরিবেশে মানুষ নিরাপদে বাস করতে এবং কাজকর্ম করতে পারে। তুমি, মানে তোমার ভিতরের লোকটি সামনে থেকে দলটিকে চালাবে, আমরা তোমার পাশে থাকব।"

"বিজলি বালকের পরিচালনায় বিজলি বাহিনি!" সহাস্যে মন্তব্য করল সুদর্শন।

কিটুর বাবা বললেন, "পুলিশের লোক এখানে কয়েকবার এসে ঘুরে গিয়েছে। তারা চায় কিটু শহরে গিয়ে পুলিশকে গুন্ডা-বদমাশদের ধরতে সাহায্য করুক। তারা অনেক টাকা-পয়সা দেবে বলেছে।"

"না না, পুলিশকে সাহায্য করলে বদমাশরা শায়েস্তা হবে না, বরং ও-ই বিপদে পড়বে," মাথা নেড়ে বললেন সরোজ শেঠ, "কিছু পুলিশের লোকের সঙ্গে অনেক বাজে লোকের যোগাযোগ আছে। একমাত্র আমাদের দলই পারবে একাজ করতে। টাকা-পয়সার জন্য চিন্তা নেই, যা দরকার, আমি জোগাড় করব।"

"আমরা চাঁদা দেব," সুদর্শন বলল।

"ঠিক আছে, কয়েকদিন পর এসে এ নিয়ে কথা বলে যাব," সরোজ শেঠ ও তাঁর সঙ্গীরা উঠে দাঁড়ালেন।

কিটু ছেলেমানুষের মতো সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "তোমরা যে দল করছ, তাতে আমি থাকতে পারব না। সত্যি বলছি।"

"কেন?" প্রশ্ন করলেন সরোজ শেঠ।

"আমি আমার মা-বাবাকে ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকতে পারব না।"

সরোজ শেঠ হেসে বললেন, "বেশ তো, ওঁদের নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে।"

মাথা নিচু করে চুপ করে রইল কিটু। সরোজ শেঠ ও তাঁর সঙ্গীরা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে কিটু মাথা তুলল, দেখা গেল চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"এ কী কিটু? তোমার চোখ..."

সরোজ শেঠের দিকে তাকিয়ে বলল কিটু, "খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই শহরে গিয়ে দল পাকিয়ে করতে হয় না। যে যেখানে আছে সেখান থেকেই সে লড়তে পারে। তুমি তো দল গড়তে চাইছ? তোমার বাড়ি, দোকান, বিষয়সম্পত্তি ও তোমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। সেটা আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না। আমি এখানেই ভাল আছি, থাকব। তুমি বরং নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে এখানে চলে আসতে পার। এখানে আমি তোমাকে পাহারা দেব, কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

কিটুর কথা শুনে সকলেই হতবাক। এ কথাগুলো তো কিটুর নয়, তার ভিতরের সেই লোকটির। সরোজ শেঠ মাথা হেঁট করে চুপচাপ পা বাড়ালেন। তিনি উপলব্ধি করলেন কিটুর ভিতরের লোকটির চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সে সব বোঝে।

ছবি: অনুপ রায়

বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়

ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়াই হল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই সব আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্য।

আমাদের স্কুল

ছোট থেকে বড় হওয়ার পথে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই সুস্পষ্ট কয়েকটি স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। বিদ্যালয়জীবন এরকমই একটি স্তর। আমাদের বিদ্যালয়ের চোখ জুড়নো পরিবেশ, সহমর্মী সহপাঠী এবং অভিভাবিকার মতো স্নেহশীলা শিক্ষিকাদের জন্য এই বিদ্যালয় আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে। ১৯২৭ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। বিদ্যালয়ের নামকরণ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যায় করলে স্কুলের স্নেহময়ী শিক্ষিকারা যেমন ছাত্রীদের শাস্তি দেন, পরমুহূর্তেই ভালবাসায় ভরিয়ে তোলেন ছাত্রীদের হৃদয়। তাঁদের স্নেহ-মমতায় আমরা প্রতিটি শিশু-বৃক্ষই পল্লবিত হয়ে উঠছি। পরে এই বৃক্ষই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উজ্জ্বল করে তুলবে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম।

বাগদেবীর আরাধনা

আমরা ছাত্রীরা পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর জন্য বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মেতে উঠি। সরস্বতী পুজোর দিন সকাল থেকে আমরা প্রতিমা সাজাই, দেবীর সামনে পুষ্পাঞ্জলি দিই, প্রসাদ বিতরণের আনন্দে মুখর হয়ে উঠি। এই সময় আমাদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয় বেশ জমজমাটভাবে। সেই ছবি ছাত্রীদের সঙ্গে অনেক অভিভাবকও যখন দেখেন, তখন খুব আন্দও হয় আমাদের।

আমাদের স্কুলের অন্যান্য উৎসব

শুধু সরস্বতী পুজোই নয়, আমরা উপভোগ করি আরও অনেক উৎসবের আনন্দ। যেমন, স্বাধীনতা দিবস, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনমহোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদি। এ ছাড়াও আমাদের স্কুলের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল 'নবীনবরণ'। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নতুন

রুটিন বাঁধা পড়ার বাইরে

রুটিনে বাঁধা পড়াশোনার বাইরেও অন্য ধরনের পড়াশোনা করার জন্য রয়েছে বেশ বড় লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরি। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে আমরা নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারি। বিজ্ঞানচর্চার জন্য রয়েছে দারুণ ল্যাবরেটরি। প্রধানত উঁচু ক্লাসের দিদিরাই এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য। এ ছাড়াও রয়েছে রবীন্দ্র হল। এটি মূলত মনোরঞ্জনের জায়গা। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নাচ, গান, আবৃত্তি কিংবা বক্তৃতা হয়।

লেখাগুলো লিখেছে টিনা মুখোপাধ্যায়, সৃজা মহাপাত্র, শুভশ্রী চক্রবর্তী, সায়ন্তী ঘোষ, সঙ্গীতা দত্ত, সুমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্বরী সাহা, সুপ্রীতি শীলশর্মা। এরা সকলেই সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে ভুলো না।

আমাদের ঠিকানা:
আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ভানুমতীর ভেলকি

শিশির বিশ্বাস

বাসটা সন্তোষপুর জোড়াব্রিজের কাছে আসতেই শেষ পর্যন্ত নেমে পড়ল শঙ্কর। অথচ টিকিট কাটা সেই সল্ট লেকের। এক আত্মীয় থাকে ওদিকে। একবার দেখা করে যাবে বলেই বেরিয়েছিল। আগামী কাল ভোরের প্লেনেই রওনা হয়ে যাবে মুম্বই। সামান্য কাজ রয়েছে ওখানে। সেটা শেষ করেই পাড়ি দিতে হবে সানফ্রান্সিসকোর পথে। ফের কবে আসতে পারবে ঠিক নেই। বাবা-মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর আগে এমনই এক দিনে সেই যে দেশ ছেড়েছিল, তারপর অনেক ওলটপালট হয়ে গিয়েছে জীবনে। এর মধ্যে দেশে ফেরা হয়নি আর। তেমন টানও ছিল না কিছু। বাবা-মা নেই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই তেমন। চরম দুঃসময়ে খোঁজও নেয়নি কেউ। সামান্য যোগাযোগ যেটুকু ছিল, তা সেই ছেলেবেলার দু'-চার জন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। তাদেরই একজন অনিমেষ। বলতে গেলে ওর জন্যই এবার দেশে আসা। কিন্তু হল কোথায়? দোষটা ওরই। অফিসে এসময় কাজের চাপ একটু বেশি যদিও, তবু চেষ্টা করলে আরও দিন কয়েক আগে ছুটি পাওয়াই যেত। ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটায় ফের মোচড় দিয়ে উঠল ওর। বড় আপশোস রয়ে গেল জীবনে।

ছেলেবেলায় বড় কাছের মানুষ ছিল অনিমেষ। স্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান। পড়াশোনাতেও ছিল মেধাবী। কিন্তু অহমিকা ছিল না কিছুমাত্র। থাকলে অনিমেষের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ কোনও দিনই হত না ওর। উদ্বাস্তু, হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান শঙ্কর পড়াশোনায় এমন কিছু ভাল ছিল না। দু'জনের মধ্যে মিল একটাই। গল্পের

গল্প

বইয়ের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ। এ ছাড়া স্কুলের খাতায় লুকিয়ে কবিতাও লিখত একটুআধটু। ছুটির পর আলোচনা হত এই নিয়ে।

আরও একটা ব্যাপার ছিল অনিমেষের। নিজে যেমন বই পড়ে আনন্দ পেত, তেমনই আনন্দ পেত অন্যকে বই পড়িয়ে। কত বই যে ও পড়তে দিয়েছে ওকে! চাইতেও হয়নি। অনিমেষের দেওয়া বই পড়েই শঙ্কর সেদিন খুঁজে পেয়েছিল বইয়ের আসল জগৎটা। বই মানে শুধু গল্প-উপন্যাস নয়। বই মানে আরও অনেক কিছু। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, এগুলোও কম আকর্ষক নয়। বিদেশি সাহিত্যের সোনার খনির সন্ধান ওই অনিমেষই প্রথম দিয়েছিল ওকে। সেই অনিমেষ তারপর হঠাৎ একদিন পড়াশোনা ছেড়ে ফেরার হয়ে গেল। সেটা সেই সাতের দশকে। রাজনীতির নানা দ্বন্দ্বে উত্তাল সারা বাংলা। সেই জোয়ারে ভিড়ে পড়েছিল অনিমেষও। যোগাযোগ ছিল না। তারপর তো কলেজের পড়া শেষ হতে না-হতেই বিপর্যয় নেমে এল তার নিজের জীবনেও। ছাড়তে হল দেশ।

এর অনেক দিন পরে ওই বিদেশে বসেই অনিমেষের খোঁজ পেয়েছিল শঙ্কর। ফিরে এসে ফের কলেজে ভর্তি হয়েছিল ও। পাশ করে শহরতলির এক প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছে। ততদিনে বিদেশে পায়ের তলায় কিছুটা মাটি খুঁজে পেয়েছে শঙ্কর। চিঠি লিখে জানিয়েছিল, 'পাসপোর্ট করে আমার এখানে চলে আয় অনিমেষ। কিছু একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু দেশ ছেড়ে, গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পড়ানো ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি ও। এর পর চিঠিতেই যোগাযোগ হত মাঝেমধ্যে। তবে শেষ দিকে কাজের চাপে ওর তরফেই ঢিলেমি এসে গিয়েছিল খানিকটা। তারপর হঠাৎই এল সেই খবর। ব্রেন-টিউমার ধরা পড়েছে অনিমেষের। দেরি না করে অপারেশনের জন্য প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভেলোরে। কিন্তু ভাল কিছু হয়নি। অপারেশনের পর প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে সারা শরীর। ইদানীং সামান্য উন্নতি হলেও ডাক্তাররা তেমন আশার কিছু শোনাতে পারেননি।

খবরটা পেয়েই শঙ্কর ঠিক করে ফেলেছিল, কলকাতা যাবে একবার। কিন্তু সব গুছিয়ে উঠতে লেগে গেল কয়েক মাস। ততদিন অপেক্ষা করেনি মানুষটি। কলকাতায় রওনা হওয়ার দু' দিন আগেই পেয়েছিল সেই মর্মান্তিক খবরটা। মারা গিয়েছে অনিমেষ। কলকাতায় এসে এই ক'দিনে তাই পুরনো অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলেও অধরা রয়ে গেল ছেলেবেলার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি। ভিতরে আপশোস তাই একটা ছিলই। জোড়াব্রিজের কাছে বাস থেকে হঠাৎ নেমে পড়ার পিছনে কারণ সেটাই।

কত বছর আগের সেই যাদবপুর, আর তার আশপাশের সঙ্গে আজকের মিল সামান্যই। তবু চিনতে অসুবিধে হয়নি। বাসটা ব্রিজের কাছে আসতেই মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগের সেই বিকেলের কথা। ক্লাস নাইন-এ পড়ে তখন। কী এক কারণে টিফিনের পর ছুটি হয়ে গিয়েছিল স্কুল। অনিমেষই পেড়েছিল কথাটা, "চল শঙ্কর, কালিকাপুরের ওদিক থেকে ঘুরে আসি। দারুণ জায়গা!"

অনিমেষের এই ব্যাপারটার কথা জানা ছিল শঙ্করের। সময়-সুযোগ পেলেই ও বেরিয়ে পড়ে আশপাশে। বিশেষ করে গ্রামের পথে। তা সন্তোষপুর-কালিকাপুরের এদিকটা তখন গ্রামই বলা চলে। বাগান আর বাঁশঝাড়ের ফাঁকে সামান্য কিছু ঘরবাড়ি। বেশিরভাগ কাঁচা। এঁদো ডোবা। ধানখেতও নজরে পড়ে। যাদবপুর এইট-বি থেকে সি এস টি সি'র দু'টো বাস তখন আসত এই পর্যন্ত। তবে ওরা সেই বাসে আসেনি। বাগান আর পাড়ার ভিতর দিয়ে বিকেলের ঝিরঝিরে হাওয়ায় পাখির ডাক আর ঝরা পাতার শব্দ শুনতে-শুনতে এক সময় এসে দাঁড়িয়েছিল খালের ধারে এই জায়গাটার কাছে। খানিক দূরে নড়বড়ে একটা কাঠের সাঁকো। সেটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত শুধু ধু ধু মাঠ, ভেড়ি আর ধানখেত। মাথার উপর নীল আকাশ আর নীচে সবুজের মেলা। উঁচু মাটির বাঁধ এঁকেবেঁকে দূরে মিলিয়ে গিয়েছে কোথায়। গাছপালার ফাঁকে উঁকি মারছে দু'-একটা গ্রাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, দূরে মাঠের ওপারে অতি ধীর গতিতে গুটিগুটি একটা ট্রেন চলেছে দক্ষিণে গড়িয়ার দিকে। দূরত্বের জন্যই মনে হচ্ছিল অমন। তবু সেই বয়সে অবাক লেগেছিল ব্যাপারটা। চলতে-চলতেই ট্রেনটা থামল এক সময়। ওটা যে গড়িয়া স্টেশন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

এর পর দু'জনে উঁচু বাঁধের আল ধরে হাঁটতে-হাঁটতে খানিক জলকাদা ভেঙে চলে গিয়েছিল অনেক দূরে, ওদিকে এক গ্রাম পর্যন্ত। মস্ত অশ্বত্থ গাছের তলায় এক মাঝবয়সি লোক ডুগডুগি বাজিয়ে জাদুর খেলা দেখাচ্ছিল। সারা গ্রাম ভিড় করেছিল সেখানে। সেই সময় লাঠির মাথায় মস্ত এক ঝুড়ি কাঁধে এই বেদেদের দেখা যেত পাড়ায়-পাড়ায়। স্রেফ খালি হাতে টুকিটাকি দু'-চারটে জিনিস দিয়ে চমৎকার সব ম্যাজিক দেখাত ওরা। দু'জনে আগেও দেখেছে অনেকবার। তবু ভিড়ে পড়েছিল সেখানে। সব মিলিয়ে বিকেলটা দারুণ কেটেছিল সেদিন। ফিরতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। আজ কোথায় কী! সেই মাঠের দিকে তাকালে শুধু তিন-চারতলা বাড়ি। সামান্য ফাঁকা জমি যা পড়ে রয়েছে, সব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা দমে গেলেও, পুরনো সেই দিনটির ছবি ততক্ষণে আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে ভিতরে। সেই গ্রামটি কি আছে এখনও? সামান্য ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ব্রিজটা পার হয়ে এক সময় ওধারে রাস্তায় নেমে পড়ল শঙ্কর। চওড়া অ্যাসফল্টের রাস্তা। দু' পাশে উঁচু পাঁচিল, ঝকঝকে পাকাবাড়ি। আনমনে কত দিন আগের সেই চমৎকার বিকেলটার কথা ভাবতে-ভাবতে হাঁটছিল ও। হঠাৎ প্যাচপেচে কাদায় পা পড়তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রায় চমকে উঠল। হাঁটতে-হাঁটতে অজান্তেই কখন এসে পড়েছে একটা কাঁচা রাস্তায়। আরে, সামনে ওই তো সেই গ্রামটা! কত দিন আগের সেই গ্রামটা তেমনই রয়েছে এখনও! সেই ধানখেত, ভেড়ির আল, তাল-খেজুরের গাছ। ওই তো গ্রামের শেষে সেই ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটা। নীচে মানুষের ভিড়। সেই কত বছর আগে, সেদিনও ভিড় জমেছিল ওই গাছতলাতেই। খেলা দেখাচ্ছিল সেই জাদুকরটি। ভারী হয়ে থাকা মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল শঙ্করের। মনে হল, কত

বছর আগের সেই দিনটিতে যেন ফিরে গিয়েছে আবার। পাশে অনিমেষটাই শুধু নেই। দ্রুত পা চালিয়ে দিল ও।

গাছতলায় ভিড়ের ভিতর থেকে ডুগডুগির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাছে যেতেই প্রায় চমকে উঠল শঙ্কর। কী আশ্চর্য! এ যে সেদিনের সেই জাদুকরটিই। সেই মস্ত গোঁফ, মুখে কাটাছড়ার দাগ, সেই ময়লা কাপড়ের পাগড়ি আর ঢিলে পোশাক। ভারী গলা, মাঝবয়সি এই লোকটিই তো খেলা দেখাচ্ছিল সেদিন। নানা খেলার পর লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো শব্দে ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে বলেছিল, "এবার ভানুমতীর খেলা দ্যাখেন বাবু। আসলি মাদারির জাদু।"

লোকটি এর পর হাত তুলে ভিড়ের ভিতর থেকে ডেকেছিল ওকে, "আসেন খোকাবাবু। এদিকে আসেন। থোড়াসা জাদুর আজব দেশ দ্যাখেন।"

লোকটির কথার ভিতর খানিক মজার গন্ধ থাকলেও একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল শঙ্কর। ইতস্তত করছিল সামান্য। তা দেখে হেসে উঠেছিল লোকটি, "কী খোকাবাবু, ডর লাগল?"

শুনে আশপাশে হেসে উঠেছিল সবাই। ও ঘাবড়ে গিয়েছিল আরও। তা দেখে, পাশ থেকে এগিয়ে গিয়েছিল অনিমেষ নিজেই। খানিক এটাসেটার পর লোকটি তার মস্ত ঝুড়ির ভিতর ভরে ফেলেছিল তাকে। তারপর ঢাকনা বন্ধ করে ময়লা জাদুহাড়টা তার উপর ঘোরাতে-ঘোরাতে দুর্বোধ ভাষায় খানিক বিড়বিড় করে 'যা-আ-আ-আ' শব্দে চিৎকার করে উঠেছিল হঠাৎ। দু' হাতে খুলে ফেলেছিল ঢাকনাটা। কী আশ্চর্য! বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিল শঙ্কর। ভিতরে চিহ্নমাত্র নেই কিছুর। একদম ফাঁকা। গোড়ায় তবু কিছু সন্দেহ ছিল, ঝুড়ির ভিতর কারিকুরি করা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটু পরে লোকটি যখন সেটা উলটেপালটে ওদের সামনে গড়িয়ে নিয়ে এল পরীক্ষা করার জন্য, তখন বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিল ও। সেটা অনুমান করে লোকটি মুচকি হেসে বলেছিল, "আপনার বন্ধুকে ভানুমতীর দেশে পাঠাইয়ে দিয়েছি খোকাবাবু।"

"ফিরবে না আর?" শুকনো গলায় বলেছিল শঙ্কর।

"সে বাত তো হামার এই ওস্তাদজি জানে খোকাবাবু," হাতের ময়লা জাদুহাড়টা নাড়াতে-নাড়াতে উদাস হয়ে বলেছিল লোকটি।

শুনে আরও ঘাবড়ে গিয়েছিল ও। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি আর। লোকটি এরপর ঝুড়ির ঢাকনাটা ফের বন্ধ করে জাদুহাড়ের টুকরোটা তার উপর ঘোরাতে-ঘোরাতে সেই দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করেছিল অনেকক্ষণ। ভারী থেকে ক্রমশ হালকা হয়ে আসছিল গলার আওয়াজ। তারপরেই হঠাৎ 'আ-যা-আ-আ' শব্দে চিৎকার করে উঠে দুম করে খুলে ফেলেছিল ঢাকনা। প্রায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল শঙ্করের। ভিতরে শুয়ে রয়েছে অনিমেষ। ঠেলা দিতেই উঠে বসেছিল ও। তারপর এসে দাঁড়িয়েছিল ওর কাছে। শঙ্কর পরে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিল অনিমেষকে। উত্তরে ও বলেছিল, "কেন রে শঙ্কর? আমি তো শুয়েই ছিলাম ঝুড়ির ভিতর।"

ও আর বলেনি কিছু। বরং বিস্ময় বেড়ে গিয়েছিল আরও। দেশে-বিদেশে জাদু জগতের অনেক রথী-মহারথীদের কাছে এই একই খেলা পরে আরও কয়েকবার দেখেছে ও। কিন্তু সে তো সেই স্টেজের উপর। আলো, ইলিউশন আর যন্ত্রপাতির হরেক কারিগরি। সেদিনের সেই অনুভূতি তাই আর হয়নি কখনও।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সেসব নয়, ওকে হতবাক করে দিয়েছিল অন্য একটা ব্যাপার। কী আশ্চর্য! এই তিরিশ বছরে লোকটির বয়স কি আর একটুও বাড়েনি? তবে ব্যাপারটা স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ক্লাসের বাংলা বইয়ে পড়া এস. ওয়াজেদ আলির সেই বিখ্যাত গল্পটা। এটা তেমনই কোনও ব্যাপার নয়তো? ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, "একটা কথা বলছি ভাই। সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা, এইখানে এই গাছতলায়, হুবহু আপনার মতোই একজন এই খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি কি আপনার বাবা?"

কী একটা খেলা দেখাচ্ছিল লোকটি। ঘাড় তুলে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল একগাল, "জি, বিলকুল ঠিক বাবু। হামি তাঁর লেড়কাই বটে।"

গলাটা সামান্য ঝেড়ে নিল শঙ্কর, "সেই তিরিশ বছর আগে আপনার বাবাকে দেখেছিলাম ঝুড়ির ভিতর থেকে মানুষ অদৃশ্য করে ফেলতে। জানেন সেটা?"

"জি হাঁ বাবু!" ফের হাসল লোকটি, "দেখবেন?"

বলতে-বলতে লোকটি বার কয়েক জোরে ডুগডুগি বাজিয়ে 'হা-আ-আ-আ' করে অদ্ভুত এক আওয়াজের পর খুলে ফেলল পাশের ঝুড়ির ঢাকনাটা, "দ্যাখেন বাবু, ভানুমতীর আসল জাদু দ্যাখেন এবার।"

"একটা কথা ভাই," লোকটির কথার মাঝেই ঢোক গিলে গলাটা সামান্য ভিজিয়ে নিল শঙ্কর। একটু ইতস্তত করে বলল, "সেদিন আপনার বাবা খেলাটির জন্য ডেকেছিলেন আমাকেই। সাহস হয়নি তখন। কিন্তু আজ রাজি আছি।"

ওর মতো বয়স্ক একজনকে নিয়ে খেলা দেখাতে রাজি হবে কিনা, সে সন্দেহটা ছিল শঙ্করের। কিন্তু আপত্তি করল না লোকটি। দেরি না করে ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঝুড়ির ভিতর। বড়সড় শরীরটাকে ভিতরে ঢোকাতে কসরত করতে হল বেশ। তবে জায়গা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ঢাকনা বন্ধ করে দিল লোকটি। এর পর মিনিট কয়েক ধরে জাদুকরের মন্ত্র পড়ার গুনগুন শব্দ শুনতে পেয়েছিল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়।

শঙ্করের সেই ঘুম যখন ভাঙল, দুপুরের রোদ তখন মরে এসেছে অনেক। চমৎকার বিকেল। মুহূর্তে লাফ দিয়ে ও যেভাবে উঠে দাঁড়াল, তাতে অবাক হয়ে গেল নিজেই। আটচল্লিশ বছরের ভারী শরীরটা হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গিয়েছে অনেক। চারপাশে তাকিয়ে ও দেখতে পেল না কাউকেই। গেল কোথায় সবাই। অবাক হয়ে যখন ভাবছে, তখনই নজরে পড়ল, অদূরে চমৎকার ঝাঁকড়া একটা নারকেলি কুলের গাছ। এই অসময়ে বড়-বড় পাকা কুলে ছেয়ে রয়েছে গাছটি। হলদে রং ধরেছে। জিনিসটা বরাবরই বড় প্রিয় ওর। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সেই ছেলেবেলার মতো ও ছুটতে শুরু করল সেই দিকে। প্রায় যখন গাছের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, গুঁড়ি বেয়ে ঝুপ করে নেমে এল একটি ছেলে। মুখ ফেরাতেই চমকে উঠল ও। ছেলেটি আর কেউ নয়, তিরিশ বছর আগের সেই অনিমেষ। আরামে কুল চিবোচ্ছে। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রস। ও ছুটে গিয়ে মুহূর্তে জড়িয়ে

গল্প

ধরল তাকে, "কুল খাচ্ছিস অনিমেষ? দে একটা," সেই তিরিশ বছর আগের মতোই বলল শঙ্কর।

গালভর্তি কুলগুলো গিলে ফেলল অনিমেষ। ওর মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "সেদিন কিন্তু বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছিলাম রে। দু'-একটা কুল তখনও ছিল পকেটে। দিইনি তোকে। যত পারিস খা আজ," বলতে-বলতে পকেট থেকে এক মুঠো কুল বের করে শঙ্করের হাতে দিল ও, "ইস! কত দিন পরে দেখা হল বল তো!"

চমৎকার একটা কুল মুখে পুরে চিবোতে-চিবোতে শঙ্কর বলল, "সত্যি রে! তোর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যে দেখা হবে, ভাবিনি।"

"বাজে কথা বলিস না," সেই কত দিন আগের মতো ওর মাথায় ছোট্ট চাঁটি মারল অনিমেষ, "ভেবেছিস বলেই না দেখা হল! নইলে কি আর বাস থেকে নামতিস এখানে?"

মৃদু হাসল শঙ্কর, "তোর কথা ভাবব না, কী বলিস! মনে পড়ে? ক্লাস ফাঁকি দিয়ে লাস্ট বেঞ্চে বসে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জির বই পড়ছিলাম। তুই একটা ইংরেজি পেপারব্যাক হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলি, 'ওসব রেখে এই বইটা পড়ে দ্যাখ শঙ্কর। ভাল লাগবে।' অনিমেষ, তুই তো জানিস, পড়াশোনায় তেমন ভাল ছিলাম না মোটেই। ইংরেজিতে তো নয়ই। তবু তোর কথায় খানিকটা মেহনত করেই পড়েছিলাম গোড়ার দিকের কয়েকটা পাতা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি' বইটা এর পর শেষ করতে বেগ পেতে হয়নি আর। প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে পড়ে ফেলেছিলাম বাকিটা। অনিমেষ, তোকে তো বলিনি, ওই বইটা পড়ে সেই বয়সে ঘুমোতে পারিনি কয়েক রাত। মনে হয়েছিল, উদ্বাস্তু কলোনির এক হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে, বছরের শেষে যে গড়িয়ে পাশ করে কোনও মতে, চেষ্টা করলে সেও পারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। হার না মানলে মানুষকে হারানো যায় না, ওই বইটা পড়েই মনে হয়েছিল সেদিন। তোকে কী করে ভুলি বল?"

গল্পে সারাটা সময় কোথা দিয়ে যে পেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি শঙ্কর। তারপর বেয়াড়া একটা ঝাঁকুনিতে চমকে উঠেছিল হঠাৎ। জাদুকর লোকটি দু' হাতে ঝাঁকাচ্ছে ওকে। দু' চোখে উদ্বেগের ছায়া। চারপাশে ঝুড়ির উপর ঝুঁকে পড়েছে আরও অনেকে। উদ্বেগের ছায়া তাদের চোখে-মুখেও। চোখ কচলে তাড়াতাড়ি উঠে বসল ও। দেখে জাদুকর লোকটি হাঁপ ছাড়ল যেন। আলতো করে কান মলে বলল, "খেলায় আজ থোড়া গোলমাল হল বাবু। কুছ দেরি হইয়ে গেল তাই। মাফ করিয়ে দিবেন।"

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে শঙ্কর। চারপাশে তাকিয়ে বুঝল, বেলা ইতিমধ্যে পড়ে এসেছে অনেকটাই। ও লোকটির পিঠ চাপড়ে দিল সামান্য। পিছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগটা বের করে গোটা তিনেক একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল তার দিকে, "রাখুন এটা। বকশিশ।"

দেখে জিভ কাটল লোকটি। রাজি হল না কিছুতেই। ইতিমধ্যে বেলা পড়ে এসেছে আরও। জাদুকর লোকটিও তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। পাতলা হয়ে গেল চারপাশের ভিড়। অগত্যা ফেরার পথ ধরল শঙ্কর। সারা মন তখন ভরে রয়েছে ওর। অনিমেষের ব্যাপারটা নিছকই স্বপ্ন, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ এই বিকেলে, কলকাতায় এই শেষ দিনটিতে তার মূল্যও অনেক। জাদুকর লোকটি বকশিশের টাকাটা নিলে ভাল লাগত আরও। ভাবতে-ভাবতে অজান্তেই মুখের ভিতর জিভ নাড়াতে গিয়ে রীতিমতো চমকে উঠল ও। কী অদ্ভুত ব্যাপার! মুখে এখনও লেগে রয়েছে চমৎকার পাকা কুলের স্বাদ। গালের ভিতর একটা আঁটিও রয়ে গিয়েছে এখনও।

এরপর সল্ট লেকের দিকে আর যাওয়া হয়নি শঙ্করের। সোজা ফিরে গিয়েছে গোলপার্কের গেস্ট হাউসে। কিন্তু তাতেও লাভ কিছু হয়নি। সারা রাত্তিরে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম আসেনি চোখে। অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারেনি কিছু। ব্যাপারটা কি সত্যিই স্বপ্ন, জাদু, না অন্য কিছু? সেই ছেলেবেলায় অনিমেষ একদিন ওকে একটা বই পড়তে দিয়েছিল। টাইম টানেল। সময়ের মধ্যেও নাকি ফাটল ধরে কখনও। তখন সেই ফাটলের ভিতর ঢুকে পড়তে পারলে মুহূর্তে পৌঁছে যাওয়া যায় দূর অতীতে, নয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবীতে। চমৎকার সায়েন্স ফিকশন গল্পটি পড়তে মন্দ লাগেনি সেদিন। তবে কি তেমন কিছুই ঘটল আজ?

শেষ পর্যন্ত মুম্বই যাওয়ার প্লেনের টিকিট বাতিল করে দিয়েছে শঙ্কর। জাদুকর লোকটির সঙ্গে আর-একবার দেখা করে না গেলে আপশোস থেকে যাবে সারা জীবন। পরদিন খানিক বেলা বাড়তেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। রাস্তাটা মনে রয়েছে বেশ। জোড়াব্রিজ পার হয়ে খুব একটা দূরে নয় জায়গাটা। তবু ট্যাক্সিটা আজ আর ছাড়েনি। আসলে ভিতরে একটা আশঙ্কাও ছিল, লোকটিকে কি আজও পাওয়া যাবে সেই জায়গায়? না পাওয়া গেলে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে তাঁর হদিশ জেনে ট্যাক্সিতেই ধাওয়া করবে সেদিকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! ব্রিজ পার হয়ে মিনিট পনেরো ঘোরা হয়ে গেল, জায়গাটার কোনও সন্ধান করতে পারল না শঙ্কর। যেদিকে যায়, শুধু ঝাঁ-চকচকে বাড়ি আর উঁচু পাঁচিল। গ্রাম বা ধানখেতের চিহ্নমাত্র নেই। সেই অশ্বত্থ গাছটিরও কোনও সন্ধান পেল না কোথাও। অথচ মাত্র গতকালের কথা। শেষে রাস্তায় এক মাঝবয়সি দেহাতি মানুষের সন্ধান পেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে এগিয়ে গেল সেদিকে।

ওর প্রশ্ন শুনে খানিক হাঁ করে তাকিয়ে রইল মানুষটি। তারপর অবাক হয়ে বলল, "এখেনে গেরামের কতা কী বলতিছেন বাবু! সে তো বহুদিন আগে উঠে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দু'-চার জন যারা ছিল, তারাও তো বছর পনেরো হল জমি বেচে চলে গিয়েছে পুবে সর্দারপাড়ার ওদিকে। কলকাতার বাবুরা জমি কিনে বড়-বড় বাড়ি তুলতিছেন।"

"কিন্তু, একটা অশ্বত্থ গাছ যে ছিল এদিকে?" শেষ চেষ্টা করল শঙ্কর।

"তা ছিল বাবু। ছেলেবেলায় কত সময় কেটেছে ওখানে। দুপুরে গাছের ছাওয়ায় ভল্লুক খেলা, জাদু খেলার আসর বসত। ছুটে এসে ভিড় করতাম সবাই। তা সে গাছও তো বাবু কাটা পড়ে গিয়েছে অনেক দিন। মস্ত এক বাড়ি উঠেছে সেখানে।"

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph দেশ সানন্দা আনন্দলোক আনন্দমেলা উনিশ কুড়ি কেরিয়ার

আপনি হয়তো আমাদের সংস্থা থেকে প্রকাশিত কোনও কোনও প্রকাশনা নিয়মিত পড়েন, কোনওটা মাঝেমাঝে পড়েন, আবার কোনওটা হয়তো একদমই পড়েন না। আপনার মতামত জানার উদ্দেশ্যে আমরা আগামী এপ্রিল-মে মাসে আসছি আপনার শহরে (তমলুক, ঘাটাল, বর্ধমান, সিউড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার)। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা অন্যান্য শহরেও আসব। যদি আপনি উল্লিখিত শহরগুলির বাসিন্দা হন এবং আপনার মতামত প্রদান করতে চান তবে নীচের আবেদনপত্রটি পূরণ করে আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন।

নাম: .... বয়স: ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা: .... পেশা: ....

যোগাযোগের ঠিকানা: ....

টেলিফোন নং: .... মোবাইল নং: ....

নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বক্সে (✓) চিহ্ন দিন।

প্রকাশনা	নিয়মিত পড়ি	মাঝেমাঝে পড়ি	আগে পড়তাম, এখন পড়ি না	পড়ি না
আনন্দবাজার পত্রিকা				
The Telegraph				
দেশ				
সানন্দা				
আনন্দলোক				
আনন্দমেলা				
উনিশ কুড়ি				
কেরিয়ার				

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা:

ম্যানেজার
কর্পোরেট কমিউনিকেশন্‌স
এ বি পি প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১

'ভিন গ্রহে জলের সন্ধান' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

১

যদি ভিন গ্রহে জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে ভীষণ মজা হবে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, মঙ্গল গ্রহে নাকি এমন সব গিরিখাত আছে, যেখানে জলের অস্তিত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। জলের সন্ধান পাওয়া মানেই জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া, বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসী। আমারও মনে হয় যে, মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তা হলে আমরাও সেই 'কোই মিল গয়া' সিনেমার 'জাদু' নামে ভিন গ্রহের প্রাণীর মতো কারও মুখোমুখি হব এবং তার সঙ্গে মজা করব। আমি তাকে অনুরোধ করব যে, সে যেন তার জাদুশক্তি দিয়ে পৃথিবীকে আরও আগের মতো সুন্দর, কোমল, হিংসামুক্ত করে দেয়। অবশ্য এই জাদুশক্তি বাস্তবে আছে বলে আমার মনে হয় না। তবু ভিন গ্রহে কোনও জলের সন্ধান পেলে সেটা বিজ্ঞানের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং আমারও খুব ভাল লাগবে।

সৌম্যদীপ রায়
অষ্টম শ্রেণি, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০ ০০৩

২

পৃথিবীতে জলের ভাণ্ডার সীমিত। জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে তীব্র জলের সঙ্কট দেখা দেবে। পৃথিবীর দু'ই মেরু, কুমেরু ও সুমেরু অঞ্চলে বিশাল হিমবাহ হল জলের অন্যতম উৎস। পরিবেশ দূষণের ফলে সব হিমবাহের ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২৫-৩০ বছরের মধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহ শুকিয়ে যাবে। এই মুহূর্তে পৃথিবী ছাড়া যদি ভিন গ্রহে জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে আগামী দিনে জলের সঙ্কট থেকে আমরা মুক্তি পাব। বিজ্ঞানীদের ধারণা, তরল অবস্থায় জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মঙ্গলের মাটির তলায়।

সুচয়ন বিশ্বাস
চতুর্থ শ্রেণি, পাঠভবন
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

৩

জনসংখ্যায় কমছে জল
বিপদ এ গ্রহে ভাই
মঙ্গলে জল থাকলে
তাই রে নাই রে নাই।
ভোঁ করে উড়ে গিয়ে
খেলতাম সারা ঘর
সেখানে বলতো না
কেউ পড়ার পড়া কর।

টোকন মান্না
অষ্টম শ্রেণি
খড়িকা বিবেকানন্দ
বিদ্যায়তন
পশ্চিম মেদিনীপুর

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

নববর্ষের দিন ফেলুদা আসবেন তোমাদের বাড়িতে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সময় কাটাবেন ফেলুদা, সঙ্গে অবশ্যই তোপসে এবং জটায়ু। সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে বিকেলের চা, এসবের আয়োজনের দায়িত্ব তোমারই ঘাড়ে। ফেলুদা অ্যান্ড কোং-এর দেখভাল করবে কীভাবে তা লিখে পাঠাও আমাদের ১০০ শব্দের মধ্যে। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে, ২০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা মে সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

আরও যাদের লেখা ভাল হয়েছে

আমরা জানি, পৃথিবীর তিন ভাগ স্থল আর এক ভাগ জল। কিন্তু এই জলের মাত্র ০.৬৯% আমাদের ব্যবহারযোগ্য। পৃথিবীতে সঞ্চিত জলের অপচয়, শিল্পের জন্য প্রচুর জল ব্যবহার প্রভৃতি জল কমে যাওয়ার কারণ। মাটির নীচে সঞ্চিত জলের পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং এই অবস্থায় যদি না আমরা জল সংরক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী হই, একটা সময় আসবে যখন জল শেষ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় ভিন গ্রহে যদি জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তা হবে খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

জল থাকলেই ভিন গ্রহে প্রাণ থাকবে। কারণ, আমরা জানি, জলই জীবন। ভিন গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতে পারব, আমাদের গ্রহে তাদের আমন্ত্রণ জানাব এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমরাও দলে-দলে মহাকাশযানে চেপে ভিন গ্রহে যাব। আর পৃথিবীতে যদি লোকসংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তা হলে আমরা মহাকাশযানে চেপে সেখানে গিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকতে পারব।

ঐন্দ্রিলা শীল
সপ্তম শ্রেণি, বড়িশা গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা

আমাদের পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় জলে। সুতরাং ভিন গ্রহে যদি সত্যিই জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে সেই জলেও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় কিনা, তাও জানা যাবে। যদি সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয়, তা হলে সেখানে তো প্রাণের অস্তিত্ব থাকতেই পারে। তা হলে তো আমরা বসবাস করতেও পারব সেই গ্রহে!

চিরঞ্জিৎ কর্মকার
সপ্তম শ্রেণি, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন

আনন্দ-র বই

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

লী লা ম জু ম দা র

সব ভুতুড়ে ৮০.০০

একে লীলা মজুমদার, তায় ভূতের গল্প। ভয়ের সঙ্গে মজা, রোমাঞ্চের সঙ্গে কৌতুক, গল্পের সঙ্গে আড্ডার আমেজ এমনভাবে মিশে থাকে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখাটি কখন যেন মুছে যায়। সব ছাপিয়ে জেগে থাকে নতুন একটা স্বাদ-রস। সেটা যতটা ভৌতিকী, ততটাই বুঝি কৌতুকী।

কাগ নয়
১৫.০০

লীলা মজুমদারের গল্প মানেই ছোটদের আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি। মানুষ, পশুপাখি, ভূত, জন্তু-জানোয়ার সব কিছু মিলিয়ে এক জমজমাটি গল্প বলার আসর— এমনই কুড়িটি গল্পের সম্ভার— কাগ নয়।

বাতাসবাড়ি ৬০.০০

বড়লামা বলেছিল বাতাসবাড়ি, পাকদণ্ডী বেয়ে অনেক উপরে উঠলে দেখা যায় বরফের পাহাড় প্রায় ঘননীল আকাশ ছুঁয়েছে। গোল চিনেমাটির বাটির মতো নীল আকাশটা পৃথিবীকে চাপা দিয়ে রেখেছে। কোথায় বাতাসবাড়ি কে জানে। ধিঙ্গিপদ, নরবু, লম্বু, সোনাম, কাঞ্চী, পম্পা, ঠুলি এবং পাদ্রীকে নিয়ে এক আশ্চর্য গল্প।

প্রোফেসর শঙ্কুর রোমাঞ্চকর কমিক্স

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

একশৃঙ্গ অভিযান ৭০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ এফ ও ৬০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু-চী-চিং • আশ্চর্য পুতুল ৬০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু-রোবু • হাড় ৭০.০০
মরুরহস্য • শঙ্কু ও আদিম মানুষ ৫০.০০
মানরো দ্বীপ • আশ্চর্জন্তু ৭৫.০০
শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ৪০.০০

ময়ূখ চৌধুরী
অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স
৪০.০০

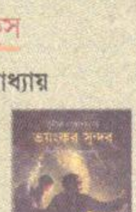

সন্তু-কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

কাহিনি: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: বিজন কর্মকার
ভয়ংকর সুন্দর
৬০.০০

নীল ও জগাদার অ্যাডভেঞ্চার
কাহিনি ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু
গোখরো দ্বীপের ডাকিনী ৬০.০০

টেনিদার কমিক্স

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি: অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী

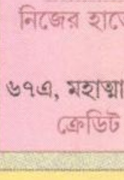

ঝাউ-বাংলোর রহস্য ৬০.০০
টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক-ইয়েতি ৭৫.০০

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ১০০.০০
দার্জিলিং জমজমাট ১০০.০০
নেপোলিয়নের চিঠি ৭৫.০০
এবার কাণ্ড কেদারনাথে ৭৫.০০

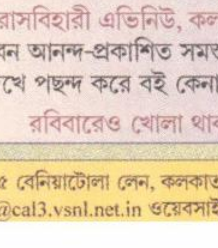

আ মা দে র ন তু ন বি ক্র য় কে ন্দ্র
নিজের হাতে দেখে, বাছাই করে পছন্দের বই কেনার সুযোগ।
৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই
১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯
এখানে পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই। নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

আ ন ন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

রিমোট কন্ট্রোলড পায়রা

এক সময় পায়রাকে ট্রেনিং দিয়ে চিঠি পাঠানো হত এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। সে তো এখন ইতিহাস। তবে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে পায়রার মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড বসিয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে ইচ্ছেমতো প্রাণীটিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বের করেছেন চিনের বিজ্ঞানীরা। উড়ন্ত পায়রাটি বাঁ দিকে যাবে না ডান দিকে, উপরে না নীচে—তা নির্ভর করবে বিজ্ঞানীদের পাঠানো নির্দেশের উপর। মাটিতে বসে নতুন এই প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁরা যেরকম নির্দেশ দেবেন, পায়রাটিও তাই করবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ব্রেনে ইলেকট্রোড বসানো এরকমই একটি পায়রাকে।

ওজন কমাবে হরমোন চিউয়িংগাম

ছোট্ট একটা চিউয়িংগাম খেলেই কমিয়ে ফেলা যাবে শরীরের ওজন। সারাদিন শুধু চিবিয়ে গেলেই হবে। অস্বাভাবিক খিদে পাবে না। সুতরাং মোটা হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। কী আছে এই চিউয়িংগামে, যা কিনা ঠেকিয়ে রাখবে শরীরের মেদ বাড়ার প্রবণতা? আসলে, মানুষের অগ্ন্যাশয় থেকে বিশেষ একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। শরীরে এই হরমোন নিঃসরণ কম হলে, খিদে বেশি পায়। বেশি খাওয়ার ফলে বাড়তেই থাকে ওজন। এই হরমোন কম থাকার জন্য খাব না ভাবলেও কিন্তু খাওয়া কমানো যায় না। খাওয়া কমানোর 'নির্দেশ' দেবে যে হরমোন, তার নাম প্যাংক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড। কিন্তু শরীরে এই হরমোনটির কাজ শুরু হয় অনেক দেরিতে। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক স্টিভ ব্লুম বলেছেন, "প্যাংক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড ইঞ্জেকশন হিসেবেও শরীরে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অন্য কোনও উপায়ে মানুষের শরীরে এটা পৌঁছনোর চেষ্টা করছি আমরা।"

ক্যানসারের উৎস খুঁজবে রোবট ডাক্তার

'ডাক্তারবাবু' আকারে-আয়তনে খুবই ছোট। লম্বায় দু' সেন্টিমিটার আর ওজন মাত্র পাঁচ গ্রাম! তাই এই ছোট্ট চেহারায় মানুষের শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতেও কোনও অসুবিধে নেই তার। তবে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝোলানো কোনও মানুষ-ডাক্তার নয়, এ হল মাইক্রো মেডিক্যাল রোবট (ডান দিকের ছবি)। জাপানের রিৎসুমিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তৈরি করেছেন এটি। মানুষের শরীরের অন্দরমহলে গিয়ে ক্যানসারের মতো মারণ রোগের উৎস খুঁজে বের করাই এর কাজ। তবে শুধু ডায়াগনোসিস করলেই তো হবে না, চিকিৎসাও করতে হবে। আর, তার জন্যও প্রস্তুত এই রোবট। মাইক্রো ক্যামেরা, মাইক্রো ম্যানিপুলেটর, বেশ কিছু সেন্সর আর ড্রাগ ডেলিভারি ইনজেক্টর সঙ্গে নিয়েই রোগীর শরীরের ভিতরে অভিযান চালাবে এই রোবট-ডাক্তার।

নতুন প্রযুক্তির স্কুটার

জ্বালানি সমস্যা যে কবে প্রকট হয়ে দেখা দেবে কে জানে! বিজ্ঞানীরা তাই চিন্তিত এখন থেকেই। বিকল্প জ্বালানির জন্য নতুন-নতুন গবেষণা চালিয়েই যাচ্ছেন তাঁরা। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল চালিত চার চাকার গাড়ি তো রয়েছেই, দু' চাকার যানও তৈরি করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। গত বছর অগস্ট মাসে মার্কিন প্রযুক্তিবিদরা বাজারে এনেছিলেন সুন্দর, ছিমছাম ইলেকট্রিক স্কুটার 'সেগওয়ে'। পেট্রোল লাগে না, ইলেকট্রিক চার্জই যথেষ্ট এই স্কুটার চালানোর জন্য। এবার তাইওয়ানের 'তাইজিন ইলেকট্রিক মেশিনারি' তৈরি করেছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল চালিত স্কুটার (উপরের ছবি)। যানটিতে মেটাল হাইড্রাইট ক্যানিস্টার-এ থাকবে হাইড্রোজেন। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার।

মনের কথা জেনে নেওয়া যাবে

মনের গোপন কথা জেনে ফেলার উপায় এবার এসে গিয়েছে হাতের মুঠোয়! পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটে মানুষটিকে দেখে যতই সাদাসিধে মনে হোক না কেন, সে যে আসলে একজন উগ্রপন্থী, নাশকতার নানা ছক কষছে মনে-মনে, তা কি জানত কেউ? জানা গেল যখন, তখন ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গিয়েছে। এরকম অজস্র ঘটনাই তো ঘটছে প্রতিদিন। তবে আশার কথা, একজন মানুষ কী করতে চায়, মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে এবার বিজ্ঞানীরা সহজেই তা জেনে ফেলবেন। বিশেষ ধরনের স্ক্যানার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে অপরাধীর ব্রেন স্ক্যান করে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিংয়ের মাধ্যমে পুলিশ জেনে যাবে অপরাধের প্ল্যান-প্রোগ্রাম। 'কারেন্ট বায়োলজি' জার্নালে চাঞ্চল্যকর এই আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান কগনিটিভ অ্যান্ড ব্রেন সায়েন্স-এর প্রোফেসর জন ডিলান হেনস।

জয় সেনগুপ্ত

সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং বিকেলে ঘণ্টাখানেক অনুশীলন, তার ফাঁকে বহরমপুর স্টেশনে গিয়ে যাঁকে রেলের টিকিট পরীক্ষকের চাকরি করতে হয়, সেই পম্পা চন্দই এবার কলকাতা ম্যারাথনের সেরা অ্যাথলিট। লিখেছেন **চন্দন রুদ্র**

কলকাতা ম্যারাথন জিতলেন পম্পা

অ্যা থ লে টি ক্স

সহ-প্রতিযোগীদের সঙ্গে পম্পা (মাঝখানে)

একেবারেই সাধারণ ছিপছিপে চেহারা, দেখলে মনেই হয় না মেয়েটির মধ্যে লড়াইয়ের আগুন লুকিয়ে আছে। অথচ দূরপাল্লার দৌড়ে এই মেয়েটিই দেশের সফল অ্যাথলিট। এবারের 'এয়ারটেল কলকাতা ম্যারাথন'-এ নেমে মেয়েদের হাফ ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আরও একবার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন বাংলার পম্পা চন্দ। নদিয়া জেলার দেবগ্রামের মেয়ে পম্পার চোখে এখন আরও বড় স্বপ্ন।

গত বছর কলকাতা ম্যারাথনে রানার্স হয়েই পম্পাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁরই গ্রামের আর-এক ম্যারাথনার রিনা দাস। মুম্বই, পুণে, দিল্লি ম্যারাথনের মতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এবারের কলকাতা ম্যারাথনে শেষ হাসি হেসেছেন কিন্তু পম্পাই। মেয়েদের হাফ ম্যারাথনে ৮২ জন প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৬৫ হাজার টাকার পুরস্কার জিতেছেন পম্পা। ম্যারাথনে দেশের সর্বোচ্চ অর্থমূল্যের পুরস্কার জিতে গতবারের ব্যর্থতাকে অনেকটাই ভুলতে পেরেছেন পম্পা। অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী সিকদারের গ্রামে বেড়ে ওঠা পম্পার পছন্দের বিষয় অ্যাথলেটিক্সই। দূরপাল্লার দৌড়ে প্র থ ম

বড় সাফল্য আসে ২০০১ সালে। ফেডারেশন কাপে নেমে ১০,০০০ এবং ৫,০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অর্জন করে নজর কেড়ে নেন তিনি। পরের বছর ওপেন ন্যাশনালে ৫,০০০ মিটারে পান সোনা। ন্যাশনাল ক্রসকান্ট্রিতে পান প্রথম স্থান। ২০০২ সালেই সুইজারল্যান্ডের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ এসে যায়। প্রথমবার বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পম্পার আক্ষেপ, "গত বছর জাপানে ওয়ার্ল্ড ক্রসকান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েও অসুস্থতার জন্য যেতে পারিনি। একই কারণে দোহা এশিয়াডেও যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছি।"

অসুস্থতা সাময়িক বাধা হয়ে দাঁড়ালেও নিজেকে আবার ফিরে পেতে বেশি সময় নেননি পম্পা। কলকাতা ম্যারাথনে নামার আগে বিশাখাপত্তনমে এবারের জাতীয় ক্রসকান্ট্রিতে নেমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এর আগে আরও দু'বার জাতীয় ক্রসকান্ট্রিতে সেরা হয়েছেন তিনি। তা ছাড়া লখনউ, হায়দরাবাদ, পুণের মতো সাতটি শহরের ম্যারাথনে অংশ নিয়ে সাতটিতেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব আছে পম্পার।

বাড়িতে বাবা-মা আর ভাইকে নিয়ে সংসার। দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা স্বপন চন্দের ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসা। কোচ অপূর্ব ঘোষের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েই পম্পা আজ দেশের সেরা ম্যারাথনার। সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং বিকেলে ঘণ্টাখানেক অনুশীলন। এর ফাঁকেই বহরমপুর স্টেশনে গিয়ে রেলের টিকিট পরীক্ষকের চাকরি। পম্পা বললেন, "ম্যারাথনে যোগ দিতে গেলে শুধু দৌড়লেই হয় না। সঙ্গে ভাল খাওয়াদাওয়াও দরকার। এক জোড়া ম্যারাথন জুতোর দাম সাত থেকে আট হাজার টাকা। আমার কোনও স্পনসর নেই। থাকলে ভাল হত।"

আগামী ২০০৮ সালের এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড এবং ২০১০ সালের কমনওয়েল্‌থ গেম্‌সের দিকে তাকিয়ে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে চাইছেন বছর পঁচিশের এই পরিশ্রমী অ্যাথলিট। জাপান এবং দোহায় না যেতে পারার দুঃখ ভুলতে চান তিনি। গত হায়দরাবাদ ন্যাশনালে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন ৩৫.২৬ সেকেন্ড সময় করে। আত্মবিশ্বাসী পম্পা বললেন, "যোগ্যতামান পেরোতে সময়টা ৩৫ সেকেন্ডে নামিয়ে আনতে হবে। প্র্যাক্টিসে আরও জোর দিলে সেই বাধা পেরনো কঠিন হবে না।"

আরতি সাহা, বুলা চৌধুরীর পর ইংলিশ চ্যানেল পেরোলেন আর-একজন বাঙালি মেয়ে। ক্রীড়াসাংবাদিকদের বিচারে এবার তিনিই পেলেন 'বর্ষসেরা সাঁতারু'র সম্মান। লিখেছেন **উত্তম রায়**

সাত সমুদ্র পেরোতে চান রশ্মি

মায়ের ইচ্ছেতেই সাঁতার শেখার শুরু রশ্মির। তাঁর তখন তিন বছর বয়স। শরীরটাকে ফিট রাখার জন্য বাড়ির কাছেই খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দেন মা। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর মা-ই নিয়ে যেতেন সাঁতার শেখাতে।

মা কিরণ শর্মা একজন ভাল অ্যাথলিট ছিলেন। স্টেট মিটে বেশ কয়েকবার পদকও জিতেছেন। রশ্মির গোটা পরিবার জুড়ে রয়েছে খেলাধুলোর পরিবেশ। মা কিরণ শর্মা জলকে ভীষণ ভয় পেতেন। তিনি নিজে সাঁতার জানতেন না, তাই জলের ভীতি কাটাতেই প্রথাগতভাবে সাঁতার শেখার জন্য সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দেন মেয়েকে।

কথায়-কথায় জানালেন রশ্মি, "কল্পনা তো দূরের কথা, কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি সাঁতারু হব, জাতীয় সেরার খেতাব জিতব কিংবা ইংলিশ চ্যানেল পেরোব।

"খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের কোচ আশিস দাস, তরুণ গায়েন, অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা চৌধুরীদের কাছে বছর তিনেক অনুশীলনের পর ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যোগ দিই। প্রথম বছর তৃতীয় স্থান অর্জন করি।

"১৯৯৬ সালে স্কুল গেমস্ সাঁতারে প্রথমবার অংশ নিয়ে দু'টো পদক জিতি। ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে সোনা আর ৮x১০০ মিটার রিলেতে ব্রোঞ্জ। প্রথমবার স্কুল গেমস সাঁতারে সোনার পদক পেতেই প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে যোগ দেওয়ার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন সফল করার জন্য কোচেদের নির্দেশমতো বাড়িয়ে দিই অনুশীলনের সময়ও।"

প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে এই ১০ বছরে রশ্মি শর্মার সাফল্য: ১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল-এ দু'টি সোনা, একটি রুপো। ১৯৯৮ সালে স্কুল গেম্স এবং ন্যাশনাল মিলিয়ে একটি সোনা, তিনটি রুপো, দু'টি ব্রোঞ্জ এবং ১৯৯৯ সালে ন্যাশনালে দু'টি সোনা, একটি রুপো। ২০০০ সালে ন্যাশনাল এবং স্কুল গেম্স মিলিয়ে দু'টি সোনা, তিনটি রুপো, ২০০১ সালে স্কুল গেম্স আর ন্যাশনাল মিলিয়ে তিনটি সোনা, তিনটি রুপো। ২০০২ সালে স্কুল গেম্স আর ন্যাশনাল মিলিয়ে পাঁচটি সোনা, দু'টি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ। ২০০৩ সালে স্কুল গেম্স ও ন্যাশনাল মিলিয়ে তিনটি সোনা, দু'টি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ। ২০০৪ সালে স্কুল গেম্স আর ন্যাশনাল মিলিয়ে ছ'টি সোনা, একটি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ। ২০০৫ সালে ন্যাশনালে দু'টি সোনা, একটি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ। প্রতিযোগিতামূলক স্বল্প দূরত্বের সাঁতারে সাফল্য পাওয়ার পর এবার লক্ষ্য লং-ডিসট্যান্স সাঁতার।

রশ্মি বললেন, "আমার আদর্শ সাঁতারু বুলা চৌধুরী। যিনি শর্ট-ডিসট্যান্স এবং লং-ডিসট্যান্স, দু'টোতেই সফল। ওঁর ইংলিশ চ্যানেল জয়ের মুহূর্ত টিভির পরদায় দেখার পর আমার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। আমি বুলা-ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করি এবং ওঁর দেওয়া পরামর্শ মতো বাংলার আর-এক চ্যানেলজয়ী সাতারু মাসুদুর রহমানের কাছে অনুশীলন শুরু করি। লক্ষ্য শুধু একটাই, ইংলিশ চ্যানেল পেরনো! আমার বারবার মনে হত, মাসুদুর রহমান-স্যার যদি দু'টো পা ছাড়াই চ্যানেল পেরোতে পারেন, তবে আমি কেন পারব না!"

প্রথম বড় সাফল্য ২০০৪ সালে লং-ডিসট্যান্স সাঁতারে। শ্রীরামপুরে অল বেঙ্গল ২০ কিলোমিটার সাঁতারে ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সময় নিয়ে রুপো জেতেন রশ্মি।

রশ্মি জানালেন, "২০০৫ সালে বহরমপুরে ৮১ কিলোমিটার সাঁতারে ১১ ঘণ্টা সময় নিয়ে রুপো জিতি। এরকমই বেশ কয়েকটা দূরপাল্লার সাঁতারে সাফল্য পাওয়ার পর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে নামি চ্যানেলের জলে।"

২০০৬ সালের ১৯ জুলাই ১১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট সময় নিয়ে কম বয়সি বাঙালি মেয়ে হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল জয় করেন রশ্মি। আত্মবিশ্বাসী রশ্মি বললেন, "ঘণ্টাখানেক কম সময়ে এই সাফল্য পেতে পারতাম। শেষ মুহূর্তে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় একটু বেশি সময় লাগল।"

স্বল্প দূরত্বের সাঁতারে সাফল্যের পাশাপাশি ইংলিশ চ্যানেল জয়ের কৃতিত্বের জন্য এবার পেলেন ক্রীড়াসাংবাদিকদের বিচারে 'বর্ষসেরা সাঁতারু'র সম্মান।

ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রশ্মি বললেন, "এই পুরস্কারটি পাওয়ার পর আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।"

এর পর আগামী জুলাই-অগস্ট মাসে জিব্রাল্টার প্রণালী সাঁতারের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন রশ্মি। সব শেষে তিনি বললেন, "আমার আইডল বুলা-ম্যাডাম। ওঁর চ্যানেল জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করতে চাই।"

রশ্মিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো: রাজীব বসু

ফুটবল মাঠে বাকনর

শিগ্‌গির এমনটাই হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারের ভূমিকায় আর দেখা যাবে না তাঁকে। ক্রিকেট ছেড়ে এবার নিজের ফুটবল অ্যাকাডেমিতে খেলোয়াড় গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। এই বিশ্বকাপের পরই আই সি সি-র সঙ্গে স্টিভ বাকনরের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে, আর বছর দু'য়েক, এর পর ক্রিকেটকে নাকি তিনি বিদায় জানাবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ক্রিকেট-আম্পায়ারের বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ালিফাইং ম্যাচে রেফারিং করার নজিরও আছে। ক্রিকেট মাঠে বির্তকে জড়িয়েছেন অনেকবার। চারটি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলানো মানুষটি ৬০ বছরে পৌঁছে বলেছেন, "আর নয়, এবার থামতে চাই।"

ক্রিকেটের বেকহ্যাম

অস্ট্রেলিয়ার মারকুটে অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে বলা হচ্ছে 'ক্রিকেটের বেকহ্যাম'। আদতে তিনি ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূত ইংরেজ সন্তান। পরে তাঁকে এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। বিশ্বকাপের আগে হাতে অস্ত্রোপচার হওয়ায় এখনও অজি দলের হয়ে তাঁর নিয়মিত মাঠে নামা হয়নি। তবে ফ্যাশনদুরস্ত ইংরেজ ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যামের স্টাইলে মাথায় একাধিক 'লকস্' রেখে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত বব উলমার

তাঁকেই বলা হত আধুনিক ক্রিকেটের 'ল্যাপটপ কোচ'। অসাধারণ গেমপ্ল্যান নিয়ে তিনিই নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট টিম। তিনি বব উলমার, পাকিস্তান দলের সদ্যপ্রাক্তন কোচ! ১৯ মার্চ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে জামাইকার ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি করার পর-পরই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে ঘনীভূত হয়েছে রহস্য, শরীরে বিষ পাওয়া গিয়েছে বলেও জানান ডাক্তাররা। অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর সঙ্গে বেটিংয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলেও মনে করেছেন অনেকে। জল্পনা চলবে আরও অনেক দিন ধরেই। প্রশ্ন একটাই, ক্রিকেট কি তা হলে সত্যিই আর শুধু খেলার পর্যায়ে থাকল না?

বিশ্বকাপ জয়ের পুরস্কার

কোন দেশ জিতবে এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ? এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। অস্ট্রেলিয়া তিনবার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু'বার এবং ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা একবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। যদিও এ পর্যন্ত কোনও আয়োজক দেশই বিশ্বকাপ পায়নি। তিনবার ফাইনাল খেলেও কাপ জয়ের স্বাদ পায়নি ইংল্যান্ড। চারবার সেমিফাইনালে উঠে একবারও ফাইনালে যেতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। এবার কি কোনও নতুন দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে? তবে যে দেশই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হোক, এবারের আই সি সি ট্রোফি জয়ীরা পাবেন ২ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার আর্থিক পুরস্কার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১০ কোটি টাকা। আর রানার্স দল পাবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কাপ না জিতলেও সেমিফাইনাল থেকে অষ্টম স্থানাধিকারী দলগুলোও আর্থিক পুরস্কার পাবে। এ ছাড়া প্রতিটি ম্যাচ জিতলে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার তো আছেই।

কিংবদন্তি ক্রিকেটার সোবার্স সম্মানিত

বার্বাডোজের বিখ্যাত কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখেই আছে ব্যাট হাতে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বার্বাডোজের দূত নির্বাচিত হয়েছিলেন আগেই। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাঁর হাতেই হল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন। দেশের মাটিতে দারুণ এক সম্মানে সম্মানিত হলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার স্যার গারফিল্ড সোবার্স। জামাইকার ট্রিলনিতে ৩২০ লক্ষ ডলার খরচে তৈরি নতুন মাল্টিপারপাস স্টেডিয়ামে নবম বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সোবার্স বলেছেন, "আমার কাছে এটা এক বিরল সম্মান।" বিশ্বকাপ সংগঠন কমিটির প্রধান ক্রিস ডেরিং-এর কথায়, "এমন সম্মান বিশ্বের এই কিংবদন্তি ক্রিকেটারকেই মানায়!"

ন'টি দ্বীপ, আলাদা-আলাদা ন'টি দেশ। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপসোয় মেতে উঠে সবাই যেন একসঙ্গে সোবার্সকে বরণ করে নিল।

চন্দন রুদ্র

10 জনের মধ্যে 9 জন শিশু* স্বাভাবিক উচ্চতার রেঞ্জের নীচে পড়ে।

এটা হতে পারে, আপনি তাকে সবচেয়ে ভালো পুষ্টি দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। তাহলে আপনি কি করে আপনার সন্তানের পুষ্টির এই ঘাটতি কমাবেন যাতে সে তার সম্ভাব্য উচ্চতা অর্জন করতে পারে? জুনিয়ার হরলিকস্ এই ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে, তার দৈনন্দিন আহারের অংগ হিসাবে। **একমাত্র জুনিয়ার হরলিক্সেই আছে DHA এবং মুখ্য পুষ্টির 100% ^দৈনন্দিন কোটা,** যা চূড়ান্ত বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। বিশেষভাবে ছোট বাচ্চাদের জন্যে তৈরী করা, দৈনন্দিন আহারের সঙ্গে মাত্র **2** কাপ জুনিয়ার হরলিকস্ তার **A থেকে Z পুষ্টি™** মেটাতে পারে।

*সূত্র : NFHS 2, 1-3 বছরের বাচ্চাদের বয়স অনুপাতে উচ্চতা। • ভিটামিন বি 2, বি 6, বি12, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, আয়রণ এবং ক্যালশিয়াম - ^2 টি পরিবেশনে, US NRC 2001 অনুসারে। • জুনিয়ার হরলিকস্ হল একটি পুষ্টিকর পরিপূরক যা দৈনন্দিন সুষম আহারের অংগ হিসাবে আপনার শিশুর পুষ্টি-প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করতে পারে। • এই উৎপাদনটি কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু-র দুধের বিকল্প অথবা 2 বছরের নীচের বাচ্চাদের শিশু আহার নয়।

5206.2007BEN

ANANDAMELA APRIL 2007 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00